পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ

আত্মসমর্পণ যোগ

শ্রীমতিলাল রায়

প্রবর্ত্তক পাব্‌লিশিং হাউস,
২৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য—এক টাকা।

প্রকাশক—শ্রীকৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায়, এম এ,
প্রবর্ত্তক পাব্‌লিশিং হাউস,
২৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
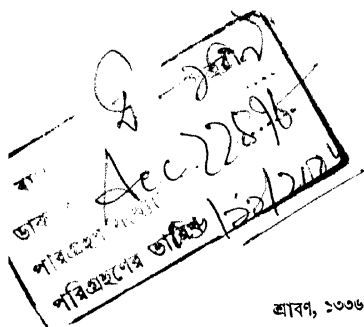
শ্রাবণ, ১৩৩৬

প্রিণ্টার—শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ
প্রকাশ প্রেস,
৬৬ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ওঁ

উৎসর্গ-পত্র

যারা আগত,

যারা অনাগত,

যারা সর্ব্বত্যাগী

ঈশ্বর-কোটীর থাক

সেই উদীয়মান নবজাতির

উদ্দেশে—

এই মর্ম্মবাণী

নিবেদন কর্‌লুম।

ভূমিকা

বাঙ্গালী জাতি ধর্ম্ম-সাধনার তত্ত্ব-কথা যুক্তি তর্কের প্যাঁচ কষিয়া, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বুঝিতে চাহে না; নিশ্বাস প্রশ্বাসের মত, সহজ ও সরল ভাবেই তাহারা সকল কথা বুঝিতে চাহে। কাশীদাস কৃত্তিবাসের রামায়ণ মহাভারত, চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির রস-তত্ত্ব, কৃষ্ণদাস গোবিন্দদাসের চৈতন্যচরিত, রামপ্রসাদ নীলকণ্ঠের কালীকীর্ত্তন, কৃষ্ণতত্ত্ব, বহুদিন ধরিয়া ধর্ম্মজীবনগঠনের উপকরণ স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী—ভারতের আদর্শ নারী-চরিত্র। রামায়ণ মহাভারতে বর্ণিত ব্রত, তপস্যা, দান ও ধর্ম্মের আদর্শে বাঙ্গালী চিরদিন অনুপ্রাণিত। বাঙ্গালীর বার মাসে তের পার্ব্বণ কেবলই উৎসবের আয়োজন নয়, ইহার মধ্যে ধর্ম্মজীবন গঠনের যথেষ্ট কসরৎ আছে, কৌশল আছে। সকল কর্ম্মের লক্ষ্য কাম্যলাভ হইলেও, আত্মশুদ্ধির জন্য শৌচ নিয়মাদির ব্যবস্থা থাকায় চিত্ত ক্রমেই অমলিন হয়। বারব্রত-

পরায়ণা হিন্দুঘরের নারী পাশ্চাত্য প্রভাবে আচ্ছন্ন শিক্ষিতা-মহিলাগণের অপেক্ষা, সর্ব্বাংশে উন্নত মন ও চরিত্র লাভ করে—কথাটা বাড়াইয়া বলিতেছি না, ইহার ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

চণ্ডীদাসের গানে জীবন-শিল্পের যে সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধীয় অনেক বৈজ্ঞানিক ইংরাজী সাহিত্যের তুলনায় কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। রাম-প্রসাদের গানে, কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতা-মৃতে অধ্যাত্ম সাধনার যে ইঙ্গিত দেখি, তাহা ভারতের সংস্কৃত সাহিত্যে বর্ণিত উচ্চ যোগ-তত্ত্বের মর্ম্ম-কথার প্রাণহীন প্রতিধ্বনি বলিয়া মনে হয় না। এইগুলি সাধকের খাঁটি অনুভূতির জাগ্রত নির্দ্দেশ রূপেই, ধর্ম্মজীবন-সাধনার পথ দেখাইয়া দেয়।

চণ্ডীদাসের একটা কথা এইখানে উঠাইয়া দিই :—

“সই সহজ মানুষ নিত্যের দেশে।
মনের ভিতরে কেমনে আইসে॥
ব্যাসের আচার করিবে যেই।
বিরজা উপরে যাইবে সেই॥
রাগ-তত্ত্ব লইয়া যে জন ভজে।
সেই সে তাহার সন্ধান খুঁজে॥

সহজ ভজন বিষম হয়।
অনুগত বিনা কেহ না পায় ॥”

এই কয়টা ছত্রে, জীবনকেই ভাগবত করিবার অব্যর্থ সঙ্কেত দেওয়া হইয়াছে। সহজকে মনের ভিতর রাখিয়া, রস-তত্ত্বের ভজন—আশ্রয়ের পরিপূর্ণ আনুগত্যেই সুসিদ্ধ হয়। আর বৈদিক আচারী যে তার পক্ষে জীবন-তত্ত্বের মীমাংসা করা দুঃসাধ্য, কাজেই তাহাকে ‘বিরজা’ উপরে উঠিয়া যাইতে হয়—‘বিরজা’ অর্থাৎ ‘বিগতার্ত্তবা’ নারীর নিঃসঙ্গ অবস্থার মত, সাধককে সংসার-কেলি-কুঞ্জ হইতে বিদায় লইতে হয়। এ জীবন কোনদিন ভাগবত রসাস্বাদে যে অমৃতময় হইবে না, কুকুরের ল্যাজের মত গুটাইয়া পড়িবে—বৈদান্তিকদের ইহাই অভিমত। বাংলায় বেদ-বিধি-ছাড়া যে সকল অভিনব সাধন-পদ্ধতির আবিস্কার হইয়াছিল, উহার মধ্যে জ্ঞানের রোশনাই না থাক্, কিন্তু এই আলো-আঁধারের অন্তরালে, অমৃত-সিন্ধুই গোপন ছিল। সাধনার জোয়ার আর একটু জোরে বহিলে, ইহার সহিত জীবনের সংযোগ অব্যর্থ হইত। কিন্তু বাংলার আউল, বাউল, সাঁই, তান্ত্রিক, সহজিয়া, কর্ত্তাভজা এইরূপ দুঃসাহসিক কর্ম্ম করিতে গিয়া যে একেবারেই ব্যর্থ

হইয়াছে, তাহা বলি না ; বরং বাঙ্গালীর জীবনে, সাধনার একটা স্বাধীন, আত্মপ্রত্যয়-মূলক,সতেজ গতিই এই সকলের দ্বারা আবিস্কৃত হইয়াছে। সে সকল নিগূঢ় রহস্যের কথা জাতি-জীবন-গঠনের পক্ষে অপরিত্যজ্য ; কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিদের মতই, বাংলার সাধন-তত্ত্বের স্তর খুঁড়িয়া আমাদের রত্নোদ্ধার করিতে হইবে।

কথাটা এই, বাংলাদেশ যেমন সমগ্র ভারতের হৃদয়-স্বরূপ, বাঙ্গালীও তদ্রূপ জাতির হৃৎপিণ্ড বিশেষ। বাঙ্গালীকে হৃদয় দিয়াই সাধনা গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার অন্যথা হইলে, যোগ অথবা তপস্যা, সবই দার্শনিক তত্ত্ব হিসাবে মস্তিষ্কবৃত্তি-রূপেই স্থান পাইবে, জীবনে উহা ফলিয়া উঠিবে না।

ঈশ্বর থাকুন আর নাই থাকুন, জীবন যে আছে— ইহা অস্বীকার করা যায় না ; আর জীবন যদি স্বপ্নও হয়, ইহার উপাধিভূত অন্তঃকরণ বিদ্যমান থাকিতে জীবন-বৃত্তি নিবৃত্ত হয় না। তখন জীবনকে মুক্ত মধুময় করিয়া তোলার যে শিল্প, তাহা অধিগত করার পথ আমাদের আবিস্কার করিতেই হইবে। এই পথই যোগ, তপস্যা, সাধনা। এইগুলি শুধু কথা নয়, একটা অভ্যাস, একটা গতি। এই গতি, এই অভ্যাস—

জীবনের অনিবার্য্য নিয়ম। কেন না, হৃদয়ের দায়ে পড়িয়াই আমাদের এই পথে আসিতে হয়।

হৃদয়ের ধর্ম্ম—প্রেম। প্রেম করিয়া, কোথায় সুখ হইয়াছে? কোন প্রেমিক ভালবাসিয়া তৃপ্ত, আমায় দেখাইতে পার কি? কেন এরূপ হয়? আশ্রয়-নির্ব্বাচনে গলদ রহিয়া যায়। প্রেমের উপর একটা "আমি"র ছাপ মারিয়া, প্রেমের দায়ে "আমার" সহিত প্রেমাস্পদকে জড়াইয়া ধরিতে চাই। তারও ত একটা শীলমোহর আঁটা "আমি" আছে; এই দু'য়ে ঠোকাঠুকি হইয়া, বাধে বিবাদ, মান, অভিমান,—মিলনের বিরুদ্ধে জাগে উপেক্ষা, ফলে বিরহ, তারপর ঘৃণা, প্রেমের এই তো পরিণাম!

তাই চিন্তামণিকে ছাড়িয়া, বিল্বমঙ্গলের প্রেম উধাও পথে দৌড় দিয়াছিল। সংসারে এমন কত উদাহরণ দিব? কত অবৈধ প্রেমের গতিও ব্যর্থতার আঘাতেই এমন আশ্রয় চায়, যাহাকে নাড়িতে চাড়িতে আড়ষ্ট বোধ হয় না—সেই তো প্রেমের ঠাকুর! এই যে সাধনার পথ, কে তাহার নির্দ্দেশ দিবে? কে জীবের অন্ধচক্ষে জ্ঞানের কাজল পরাইয়া, আলোর শিখায় নূতন দৃষ্টি ফুটাইয়া তুলিবে? তাহাকেই প্রথম আশ্রয় করিতে

হয়। ইহাই দীক্ষা ; ইহাই গুরু-করণ। এই পদ্ধতিকে উড়াইয়া, সাধন-জগতে কেহ একপদ অগ্রসর হউক দেখি! সাধনার ঘরে আবর্জ্জনা দূর করা অবশ্য কর্ত্তব্য ; কিন্তু আবর্জ্জনা দূর করার সঙ্গে ঘরের বনীয়াদ উপড়াইয়া ফেলার চেষ্টা বাতুলতা। নদীর প্রথম আবেগ উচ্ছ্বাস-মদে সমুদ্র-যাত্রার প্রয়োজন অস্বীকার করিতে পারে ; কিন্তু উৎস-মূল হইতে অজস্র ধারা-নির্গমনের ফলে, ঢল দিয়া স্ফীত বক্ষে উহাকে গড়াইয়া চলিতে হয় কোন দিকে? মানুষও অহং-মদে, আত্মকেন্দ্র নিরূপণ করিয়া উদ্বুদ্ধ হয় ; কিন্তু প্রেমের দায়ে, তাহাকে ক্রমেই মানুষ খুঁজিতে হয়। সে কোন মানুষ?

"সতের সঙ্গে, পিরীতি করিলে
সতের বরণ হয়।
অসতের বাতাস, অঙ্গেতে লাগিলে
সকলি পলায়ে যায়॥"

প্রেমের দাম যেমন, তেমন মানুষ মিলে। তাই গুরুকরণ —উহা সাধনার ফল। হৃদয়ের ধর্ম্ম—প্রেম। কিন্তু উহা নির্ম্মল করিয়া তোলার যে শিক্ষা, যে সাধনা, তাহা কয়জন করে? মোটামুটি তাহার একটা সঙ্কেত দেওয়া যায়। তপস্যা, বিদ্যা, এমন কি সমাধির দ্বারাও ইহা লব্ধ হয় না—প্রজ্জ্বলিত দীপশিখার সাহায্যেই দীপ

জ্বালিতে হয়, প্রেমের স্পর্শেই প্রেম জাগে। এ স্পর্শ যে পায়, সে কৃপাসিদ্ধ। তবে ইহা লাভ করিবার জন্য, নিজের হৃদয়ে অনুরাগের উৎস সৃষ্টি করিতে হয়। প্রদীপের বক্ষে তৈল, সলিতা সজ্জিত রাখার মত, নিজের হৃদয়কে প্রস্তুত করিয়া তুলিতে হয়। সে প্রস্তুতি আর কিছু নয়, ভগবানে যাহাতে অনুরাগ জন্মে, যে কর্ম্মে ইষ্টের সন্তোষ-বৃদ্ধি হয়, একনিষ্ঠ হইয়া তদনুযায়ী আচার অনুষ্ঠানই ইহার বিধি।

তাই জীবনের কোন কর্ম্মে বাসনা রাখিতে নাই। বাসনাযুক্ত কর্ম্ম আর অজ্ঞানকৃত কর্ম্ম—দুইই সমান, দুইই বন্ধনের কারণ। ইহাতে অনর্থ-নিবৃত্তি না হইয়া, ঈশ্বর হইতে দূরে পড়িতে হয়।

বাসনায় দুঃখের উৎপত্তি। বাসনা-শূন্য হইলে স্বতঃই অনুরাগের উদয় হয়। এই অনুরাগের আকর্ষণেই, জীবন ছুটে—ধাবিত হয় সেই বিদ্বানের দিকে, যিনি গুরু, যিনি নারায়ণ। গুরু-লাভ হইলে, ভক্তির সাধনা আরম্ভ হয়। এই ভক্তি যত ঐকান্তিক হয়, দৃঢ় হয়, ততই বৈরাগ্য ও জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। বৈরাগ্যে আনে —শুদ্ধি, জ্ঞানে ঈশ্বর-প্রাপ্তি ঘটে। ইহাই সিদ্ধ জীবনের ভিত্তিস্বরূপ।

সাধনার এই সংক্ষিপ্ত সূত্রটুকুই এই বইখানিতে বলা হইয়াছে। এই একই কথা নানা দিক্ দিয়া আলোচনায় হৃদয়গ্রাহী ও সুপরিস্ফুট করিয়া তুলিতে চাহিয়াছি। এখন চাই—স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া ঈশ্বর-তত্ত্বে উঠিবার জন্য জাতির প্রবল ঔৎসুক্য। আত্ম-জীবনের দুঃখ, জাতিজীবনের দুঃখ, জগজ্জীবনের দুঃখ নিবারণ সবই নির্ভর করে—জীবের পরম দিব্য জীবন-লাভের উপর। সে জীবন, সে জন্মের জন্য মৃত্যুপণ চাই। জাতির দুয়ারে অতিথির বেশে ধর্ম্ম আজ মানুষের আত্মদান চায়। জীবনের সর্ব্বস্ব না পাইলে, ভারতের সনাতন ধর্ম্ম এবার আর দুয়ার ছাড়িয়া উঠিবে না,

"বারে বারে ঠেল্‌বি দুয়ার হয়ত দুয়ার খুল্‌বে না।"

সে কিন্তু এবার আর ফিরিবে না—জাতিকে এই উৎসর্গ-যজ্ঞে আত্মাহুতি দিয়াই, দেবজন্ম লাভ করিতে হইবে। ভারত চায় দেবজাতি—ঈশ্বরের চাওয়াই ভারতের কণ্ঠে ঘোষণা তুলিয়াছে। নবজাতির এই বেদ-মন্ত্র তরুণের বুকে সাড়া তুলুক, ইহাই প্রার্থনা।

*   *

*
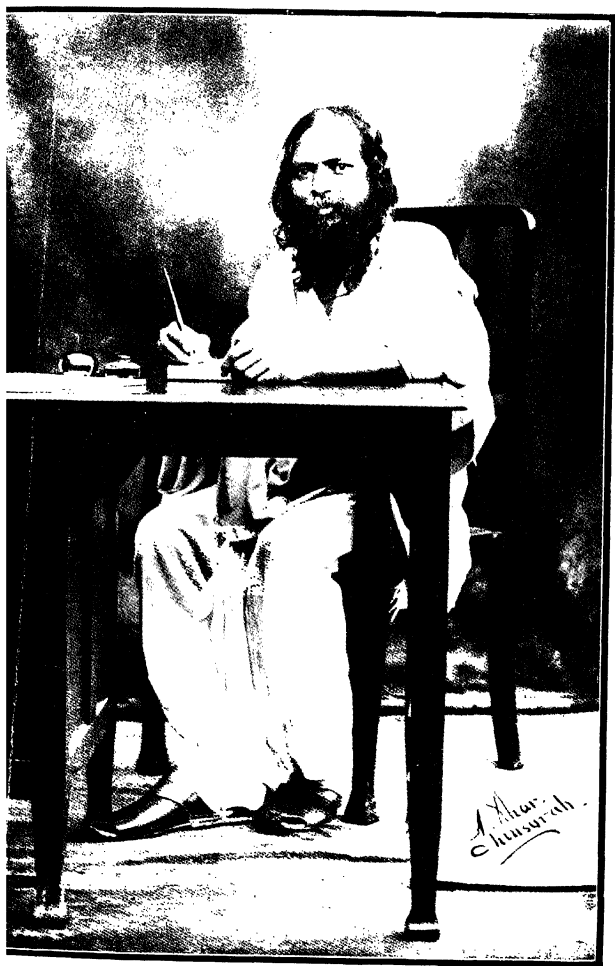
শ্রীমতিলাল রায়

আত্মসমর্পণ যোগ

১

"বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
কামগায়ত্রী কামবীজে যাঁর উপাসন॥"

কথাটা তলাইয়া বুঝিবার বস্তু। বাঙ্গালীর জীবন-সাধনার নিগূঢ় তত্ত্ব বাঙ্গালী সন্ন্যাসীর কণ্ঠে বড় উদাত্ত-কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়াছিল; বেদ, উপনিষদ্, গীতার চাপে সে সুর আজ ঢাকা পড়িয়াছে। বাঙ্গালীর জীবন-বেদ অভিনব, বাংলার আত্মতত্ত্ব বেদ-বিধি-ছাড়া। আত্মহারা হইলে অমৃতেরও সুব্যবহার হয় না, বেদ উপনিষদের স্থানে হইবে কি? বাঙ্গালীর আজ প্রাণ-বেদী ভাঙ্গিয়াছে, মাথাটাই কিঞ্চিৎ ডাগর হইয়া উঠিয়াছে।

শুধু বাঙ্গালী বলি কেন, ভারতের হিন্দু আজ নিজ বাস-ভূমে যে পরবাসী, তার অধ্যাত্মহেতু ইহাই। বাহিরটা তো আত্মস্বরূপের হুবহু প্রতিবিম্ব। অন্তরে যে মুক্ত, বাহির তার বন্ধনমুক্ত; অন্তরে যে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ,

বাহিরে তার প্রতিষ্ঠান অটল। এ জাতিটাই আত্মধর্ম্ম হারাইয়াছে, তাই পরধর্ম্মের চাপে চূর হইয়াছে। এই দুরবস্থার প্রতিকার—আত্মধর্ম্মের আবিষ্কার; ভারতের ধর্ম্ম পুনঃ জাগ্রত করা। কোন আদর্শের বা ঐতিহাসিক সভ্যতার অন্ধ অনুরাগী হইলেও, আমরা বাঁচিব না। চাই সনাতনটীকেই খুঁজিয়া বাহির করা, যাহা যুগে যুগে নব নব বেশে জাতির চির যৌবন রক্ষা করে। আর এই অনুসন্ধানে পৃথিবীর পুস্তকাগার উজাড় করিলে, ঐ মাথাটাই আরও কিছু ভারী হইয়া উঠিবে, পা দুটায় জোর পাওয়া যাইবে না। ধর্ম্মবল একটা পরিপূর্ণ শক্তি, মাটীর উপর ভর দিয়া দাঁড়াইবারই সামর্থ্য রাখে। ধর্ম্মের নামে অক্ষমতা—আত্মপ্রত্যয়হীনতারই লক্ষণ। এই গোড়ায় গলদ রাখিয়া জাগরণের সকল প্রয়াস তাই আজ ভিত্তিহীন।

আমরা আশ্চর্য্য হইয়া যাই—যখন ধর্ম্মসাধনার অটল ভিত্তির উপর কমলার রত্নসিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া আমাদের প্রয়াস অর্থসাধনায় নিয়োগ করি, তখন আমাদেরই বন্ধুদের সবিস্ময়ে বলিতে শুনি ‘গেল গেল, এইবার ইহাদের এত বড় ত্যাগ তপস্যাটা

মাটী হইল !'। ইহাও যে ধর্ম্ম, ইহা বুঝিবার সাধ্য নাই, শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইবারও উপায় নাই। বিরুদ্ধ যুক্তির অভাব হইবে না। তাই সাফল্যের স্বর্ণকিরীট ঝিক্‌মিক্ করিয়া যতদিন না ফুটিয়া উঠে, ততদিন একদল জীবনের ধর্ম্মে দীক্ষিত নারী পুরুষকে 'যত শুনি কর্ণপুটে, সকলই মার মন্ত্র বটে' বলিয়া অক্লান্ত চরণে আগাইতে হইবে।

পথের নির্দ্দেশ দেয়—সাধনা। এ সাধনা কার? জীব সাধনা করিবে কেন? করিলেই বা কি দিয়া করিবে? জীব তো অহঙ্কার নয়; অহঙ্কার বিকার। অহঙ্কার দিয়া যাহা করিবে, তাহাই ভুল হইবে, তাহাই অকল্যাণের কারণ হইবে।

অহঙ্কার ঘুচাইবার একমাত্র উপায়—আত্মসমর্পণ। 'আত্মসমর্পণ করিলাম' বলিলেই তো অহঙ্কার মরে না। কিছুদিন চলে খানিকটা দ্বন্দ্ব। অহং-কে মরণের পথেই ঠেলিয়া দেওয়া হয়। দেয় কে? অহঙ্কারের অপেক্ষা অধিক শক্তিধর যে সে। সে কে? এই অহঙ্কার যার প্রতিবিম্ব—তিনি। তাঁহারই স্বরূপ জানিতে প্রাণ বড় আকুল হইয়া উঠে।

স্বরূপ কি? কেমন করিয়া বুঝাইব? অন্ততঃ অহঙ্কার যে ঘা খাইতেছে, ইহা বুঝা যায়। সে ঘা দেয় কে, তাহা ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠে। যাহা ফুটিয়া উঠে, তাহাই জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা—একই তিন, তিনই এক। ইহাই সত্তা। তুমি, আমি, সে—এই অখণ্ড অদ্বয় তত্ত্বেরই বিকাশ। এই সত্যানুভূতির উপরই তো ঐক্যের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা। এ জাতির অনৈক্য-ব্যাধি দূর করার অব্যর্থ সঙ্কেত ধর্ম্মসাধনার উপরই নির্ভর করে।

অহঙ্কারের সহিত অবিকৃত তত্ত্ববস্তুর দ্বন্দ্বকালে নিজের কাজ থাকে না, কিন্তু কাজ হয়। অহঙ্কার দূর করার কাজই তো কাজ, সে কাজের ফল দেখিতে নাই, ফল নাই তো দেখিবে কি? উহার ফল—অহং নিরসন হওয়া। ইহার ভোক্তা যিনি, তিনিই কর্ত্তা। আত্মারাম না হওয়া পর্য্যন্ত দ্বন্দ্ব চলে। এ দ্বন্দ্বকালে ঈশ্বর-তত্ত্ব—গুরু-রূপী। বিধেয় যাহা, তাহাই অনুবাদে স্থির হয়।

বিষয়টা সত্যপ্রার্থীর কাছে খুবই পরিস্কার। ধর্ম্মতত্ত্ব বুদ্ধিগ্রাহ্য যেখানে, সেইখানেই কূট সমালোচনা। কে অবতার হইল, কে ভগবান সাজিল, কে গুরুগিরি আরম্ভ

করিল, ইত্যাদি লইয়া লঘুচিত্ত কলরব করে। ইহারা ভিতরের খবর পায় নাই। যাহা প্রয়োজন তাহার জন্য, অদ্বয়-বস্তু যেখানে যেমনটী অনুবাদ আকারে ফুটিয়া উঠার দরকার, সেখানে তেমন ভাবেই আত্মপ্রকাশ করেন। যাহার যেটী মৃত্যুবাণ, সে সেইটীই আশ্রয় করে। এই সব কল্পের কথা। মানুষের টীকাটিপ্পনী শূন্য কুম্ভের ঝনৎকার মাত্র।

বস্তু প্রাপ্ত হইলে, অর্থাৎ 'অহ'এর মূল উপড়াইয়া, সত্তার অধিকার আধারে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে, যোগের কাজ সুরু হয়। 'অহং' রাখিয়া যায় দুর্জ্জয় স্বভাব—দোয়াতের কালি ফেলিয়া দিলেও, থাকে দুরপনেয় দাগ; তাহা বহুবার ধৌত করার পর তবে পরিস্কার হয়। এইরূপ শুদ্ধি-ক্রিয়া বহুদিন ধরিয়া চলিতে থাকে। চেতনার সহিত কাজ হয়। হইবে না কেন? চৈতন্যময় বস্তুই তো তখন জাগ্রত। তিনিই কর্ত্তা, তিনিই অনুমন্তা। আধেয় ও আধার, দুয়ের মধ্যে বেশ ভেদ বুঝা যায়। আবার বলিতেছি, এই বুঝেনও তিনি, নতুবা বুঝে কার সাধ্য। তিনি স্বয়ং বুদ্ধি-সত্তা, যাহা হয় তাহাতেই ভাসিয়া উঠে।

সাধনার স্তরভেদে, নানা নাম দেওয়া যায়। প্রথম উদ্যোগ-পর্ব্ব—ইহা জীব-যোগ অর্থাৎ আভাসে বোধ হয়, যেন জীবই কাহারও দ্বারা চালিত হইয়া যন্ত্রবৎ সাধনা করিতেছে। তারপর, প্রকৃতি-যোগ। তখন জীবাভাস অপসারিত হইয়া, প্রকৃতিই নিজে অনন্ত মহাশক্তিরূপে যোগ সাধিয়া চলে। পূর্ব্বোক্ত অবস্থার ইহা পরিণতি। তারপর ঈশ্বর-যোগ। তখন এই প্রকৃতিকেও অতিক্রম করিয়া, ঈশ্বরই কর্ত্তারূপে, আধারে অবতরণ করেন। এই অবস্থায় সাধক জীব বা প্রকৃতি নহে, স্বয়ং ঈশ্বর। এইরূপ মায়া যত ফিকা হইয়া আসে, রূপান্তর তত হয়। দর্পণ যেমন যেমন অমলিন হইবে, সূর্য্যবিম্ব তত স্ফুটতর হইয়া উঠিবে। যিনি ফুটিয়াছিলেন জীব-রূপে, তিনিই ফুটিলেন প্রকৃতি-রূপে, ঈশ্বর-রূপে। অনন্ত পরমেশ্বর-তত্ত্বের চরম আশ্রয় যে পুরুষোত্তম যোগ, তাহাও এই আধারে সিদ্ধ হইতে পারে।

মায়ার আবরণ-স্তর একে একে উদ্ভিন্ন হইয়া জীবাধারেই পুরুষোত্তম-যোগ সাধিত হইতে চলিয়াছে। ইহা যোগের পথ, ঊর্দ্ধমুখী যাত্রা। আবার বিলোম-ক্রমে স্বয়ং ভগবান স্তরে স্তরে নামিয়াছেন স্থাবর

জঙ্গমরূপে—স্থূলচেতনায়। অধম কীট পতঙ্গ, ত্রসরেণু পর্য্যন্ত তাঁরই চেতনার প্রতিবিম্ব।

ইহা ভাগবত লীলা। আমাদের করিবার কিছুই নাই। উঠিবার ইচ্ছাও তাঁর, নামিবার ইচ্ছাও তাঁর। উঠিবার ইচ্ছা যেখানে মূর্ত্ত সেইখানেই যোগ, নামিবার ইচ্ছায় প্রাকৃত জীবন। একে প্রকাশ ও অন্যে অপ্রকাশ—প্রভেদ এইমাত্র। প্রয়োজন-ভেদে লীলার বিভিন্ন অবস্থান্তর পরিকল্পিত হয়। যোগে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন—সে প্রকাশ ভাবঘন, প্রেমঘন, আনন্দঘন। এই নিবিড় অনুভূতির ছেদ নাই, ভাব অনন্ত, অফুরন্ত। কেহ এই অবস্থায়, "দে মা পাগল করে" বলিয়া মাতৃ-প্রেম-সুরা পানে অমর হইয়াছে, কেহ বা ইহাকে "সৎ-চিৎ-রূপ-গুণ-সর্ব্ব-পূর্ণানন্দ" বলিয়া ভাবের আনন্দে নৃত্য করিয়াছে।

ঈশ্বরপ্রেম নিত্য সিদ্ধ। এই আনন্দ চিদঘন বস্তু। ইহা সাধিবার নয়। তাই সাধিয়া ইহা কেহ পায় নাই। শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে ইহার উদয় হইয়া থাকে। সাধেন স্বয়ং ভগবান—আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য।

উপরে যাহা ইচ্ছা, নীচে তাহাই কামনার আকারে প্রকাশ পায়। ভগবান যাহা ইচ্ছা করেন, তাহা প্রণয়-

রূপে আধারকেও শিহরিয়া তুলে। প্রণয়-রূপ রতিও বিকার, কিন্তু ইহা প্রেমের, ঈশ্বরপ্রেমের বিকার। বীজ একই, প্রয়োগভেদে কামনার শুদ্ধাশুদ্ধ গুণ-লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই দিব্যোন্মাদনার বিকার-লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল বাংলার শ্রীচৈতন্যে, রামকৃষ্ণে। ইঁহারা প্রেমের দায়েই উন্মাদ, সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী সাজিয়াছিলেন।

এই জন্য জীবের কণ্ঠে যে ঈশ্বরোপাসনার গায়ত্রী স্ফুরিত হয়, তাহা যে প্রণয়-বিকার রূপ কাম-গায়ত্রী ইহা অনায়াসেই বলা যায়। যে মন্ত্রে জীব তন্ময় হয়, তাহা কামেরই অমর বীর্য্য। জীবের কামনা পূরণ করেন ভগবান, তাই তিনি চিরকিশোর নবীন মদন। সর্ব্বকামনার তৃপ্তিতে জীব সিদ্ধ হয়, অমৃতময় হয়। সে তৃপ্তির আস্বাদে মরণের ছায়া নাই। তাই এ আস্বাদ অপ্রাকৃত, অমৃত-তত্ত্বের। এ লীলা গোলকের, ধরণীতে বৃন্দাবন-রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

এই সাধনার সিদ্ধি এখনও পাওয়া যায় নাই। মদন-দহনে ঝুরিয়া, প্রাণনাথে শুধু ভাবের ঘরে ধরা গিয়াছে, বস্তুতন্ত্র জীবনে তিনি অবতরণ করেন নাই। তাঁকে অপ্রাকৃত ক্ষেত্র হইতে প্রাকৃত জীবনে নামাইতে

হইবে। যে অজ্ঞান ইহজীবন হইতে পর-চেতনাকে বিচ্ছিন্ন বিভক্ত করিয়াছে, তাহা দূর করিয়া, সচ্চিদানন্দকেই দেহপ্রাণমনে লীলায়ত করিতে হইবে। তবেই অসিদ্ধ জগৎ সিদ্ধ হইবে। মর্ত্ত্য-জীবনের রূপান্তর হইবে। নতুবা হেঁয়ালীর মতই চিরদিন গাহিতে হইবে—

কূলের উপর, ফুলের বসতি
তাহার উপরে ঢেউ।
ঢেউ'র উপর ঢেউ'র বসতি
এ কথা জানে না কেউ॥

বাংলার সন্ন্যাস এই জন্য লয় নয়, মুক্তি মোক্ষের তপস্যা নয়। বাংলা কেন, এ পৃথিবীর ইহা সনাতন ধর্ম্ম নহে। বিশ্বের কণ্ঠে এই একই সুর ঝঙ্কার দিয়া উঠে। প্রাকৃত হইতে অপ্রাকৃতে উঠিয়া, ঈশ্বর-স্থিতির স্বরূপ অনুভূতিগ্রাহ্য করিতে আমাদের বহু যুগ কাটিয়াছে; আজ এই প্রাণের ক্ষেত্রে ভগবানকে নামাইবার জন্য জীবের কণ্ঠে বিরহের গান করুণ মূর্চ্ছনা তুলিয়াছে। তাঁহাকে না পাইয়া তাই আবার যদি ডোর কৌপীন লইয়া দোরে দোরে মাধুকরী ভিক্ষা করিতে হয়, তাহা মুক্তি মোক্ষের ছলনায় নয়—বাঙ্গালী

বৈরাগী প্রেমের দায়ে, প্রাণনাথকে বুকে না পাইয়া এ তার বিরহের তপস্যা। তুমি অবতরণ না করিলে, হে ভগবান! এ ধরণীর সার্থকতা কি? তোমার প্রণয়-বিকারে যৌবন-জোয়ারে যদি তুফানই না উঠিল, তবে এ প্রকাশের লীলা তো ধন্য হয় না!

বাংলার সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর কণ্ঠে যে ত্যাগ বৈরাগ্যের বাণী উচ্চারিত হইয়াছে, তাহা মায়াবাদের বিকৃত ঝঙ্কার নয়, তাহা জীবনে ভগবানের প্রত্যক্ষ অবতরণের আকুলতা—বাংলার ধর্ম্মসাধনা ইহা ভিন্ন অন্য কিছু নহে। বাঙ্গালী যদি জীবন ভাগবত করিতে পারে, তবেই মর্ত্ত্যে স্বর্গ-রাজ্য-প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে। ত্যাগে বৈরাগ্যে শুধু অনুভূতির পর্দ্দায়, ঈশ্বরের লীলা বিচ্ছুরিত হইলেই চলিবে না—ঝড়ো পাতার মত উহা মাটীতে লুটাইয়া পড়িবে। জীবন-বৃক্ষে ঈশ্বর-পরশের ঝড় তুলিতে হইবে। দিব্য জীবনের জন্য আরও একবার যদি গৃহ ছাড়িতে হয়, সর্ব্বত্যাগী হইতে হয়, তাহার জন্য বাংলার তরুণ ইতস্ততঃ করিবে না। অহঙ্কার ও কামনার বোঝা বহিয়া কোটী কোটী লোক মৃত্যুর অভিসারে ছুটিয়াছে, জীবনে অমৃত-প্রবাহ

নামাইয়া আনিবার জন্য এ দেশে অসংখ্য ভগীরথ গোতমের অভাব হইবে না। কেবল ভয়—মায়াবাদের আবর্ত্তে পড়িয়া চুবান খাওয়ার! যেখানে উৎসর্গ নাই, যেখানে অহঙ্কারের তপস্যা, সেইখানেই অতীতের ভ্রান্তি ঘেরিয়া ধরে। চির নূতন পথে যাত্রা করার যাত্রী, তোমাদের শুভাগমনের প্রতীক্ষায় দিন গুণিয়া যাই। তোমরা উঠ, জাগ, ঈশ্বর-প্রাপ্তির আনন্দে, মাটীকে সিদ্ধ করার জন্য উদ্বুদ্ধ হও। ধর্ম্ম-রাজ্যের ভিত্তি এই পৃথিবীর বুকেই স্থাপন করিতে হইবে। এই জীবন-বেদীতেই ভগবানের লীলার আসন পাতিতে হইবে।

২

পূর্ণ যোগের জন্য চাই পূর্ণ তত্ত্বের অনুসরণ। পূর্ণ তত্ত্ব ভগবান, তাই ভগবানে আত্মসমর্পণ—পূর্ণ যোগের একমাত্র অনুষ্ঠান। আত্মসমর্পণ কেমন করিয়া করিতে হয়, এ প্রশ্ন তাহার জাগে না, যাহার বস্তু-নির্দ্দেশ হইয়াছে। দীক্ষায় বস্তু-নির্দ্দেশ হয়। বস্তু, তত্ত্ব, ইষ্ট, ভগবান, একেরই নামান্তর মাত্র।

আত্মসমর্পণ যোগে তপস্যা নাই, কৃচ্ছ্রতা নাই, আসন প্রাণায়াম নাই, অথচ সবই আছে—কিন্তু তাহা সাধককে করিতে হয় না, প্রয়োজন হইলে ভগবান নিজেই করেন। আত্মসমর্পণের দীক্ষা সম্পূর্ণ হইলে জীব দ্রষ্টা—কর্ত্তা হন ভগবান্। ইষ্ট-বস্তুই সাধক হইয়া অন্তর্য্যামীর আসন গ্রহণ করেন; কাজেই জীব ধীরে ধীরে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে। এইরূপ চেষ্টাহীন স্থির অবস্থাই এই যোগের প্রাকৃত অবস্থা—ইহার অন্যথা হইলে বুঝিতে হইবে, দীক্ষা ঠিক মত হয় নাই।

আত্মসমর্পণের দীক্ষা—লোকাচার-প্রবর্ত্তিত কোন অনুষ্ঠান নহে। ইহার কোন আয়োজন নাই, শব্দ-মন্ত্রেরও প্রয়োজন হয় না। অনেক ক্ষেত্রে দীক্ষা হইল কি না মনও জানিতে পারে না। কোথায় কে দীক্ষা দিল, তাহাও বুঝা যায় না; কিন্তু যোগের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে বস্তুর আবির্ভাব হয়, তখন গুরু-বস্তু, ঈশ্বর-তত্ত্ব প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। অস্বীকার করা যায় না, বিপ্লবী মনও সেখানে মাথা নত করে। এই ইষ্ট-তত্ত্ব আত্মা নহে, ব্রহ্ম নহে, ইহা তুরীয় নহে—স্বয়ং ভগবান্, পঞ্চতত্ত্বে গড়া রসঘন শৃঙ্গার-মূর্ত্তি। আত্মসমর্পণ যোগী এই জন্য লয় চাহে না, সমাধি চাহে না, সার্ষ্টি, স্বারূপ্য, এমন কি সাযুজ্য লাভেও উদাসীন, চায় বিশুদ্ধ ভক্তি—যাহা দিয়া সে তাহার সবখানি ভরাইয়া তুলিবে রসাস্বাদের অশেষ তৃপ্তিতে। আত্মসমর্পণ যোগ মানুষের কোনও অঙ্গ অসম্পূর্ণ রাখে না, প্রতি শোণিত-বিন্দুটি পর্য্যন্ত শুদ্ধ ও সিদ্ধ হইয়া তৃষিত চাতকের মত রস-মাধুর্য্যে ভরিয়া থাকিতে উন্মাদ হইয়া উঠে। তাই সাধক সর্ব্বদা সর্ব্বভাবে নিশ্চিন্ত হইয়া, ভগবানেরই ভজনা করে। ইহাতেই সে সিদ্ধ হয়, তৃপ্তি পায়,

অমরত্ব লাভ করে। জীবনের প্রতি পর্ব্ব অপার্থিব রসে ও অমৃতে অভিষিক্ত হয়।

যে যোগে শুধু জ্ঞানবিকাশের দ্বারা ঈশ্বরানুভূতি হয়, তাহা আত্মসমর্পণ যোগ নহে। জ্ঞানীরা ঈশ্বরকে ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি করে; জীবনের অনেক কিছু বর্জ্জন না করিলে, ইহা ঘটে না। এইরূপ, যোগ-সমাধিতে সাধকের আত্মদর্শন হয়, কিন্তু দেহীর সকল অংশ ইহাতে বিকশিত হয় না; কারণ এই প্রকার সাধনায় সবখানি সার্থক করার প্রয়োজন নাই, বরং অনেক অংশই বর্জ্জন করিয়া ইহা সিদ্ধ করিতে হয়। এমন কি, ভক্তিযোগও আত্মসমর্পণ যোগ নহে। ভক্তিতে হৃদয়ের বিকাশ হয়, প্রেম, বিহ্বলতা, স্বেদ, কম্প, অশ্রু, পুলক প্রভৃতি আনন্দের ঘোরে ভক্ত উন্মাদ হইয়া থাকে; আত্ম-সমর্পণ যোগে জীবের আধার স্থৈর্য্যের শক্তিতে অটল, সর্ব্বাঙ্গ অমৃতময় হয়। তখন কিছুই ত্যাগ করিবার থাকে না, পূর্ণ ভোগের আনন্দে সর্ব্বাবয়ব পুষ্ট ও সুস্থ হয়। বসন্তের আবির্ভাবে তরুলতা যেমন শ্রীসম্পন্ন হয়, আত্মসমর্পণ যোগের প্রভাবে সাধক তেমনি অন্তরে বাহিরে দিব্যকান্তি ও মাধুরীমণ্ডিত হয়। এই ঐশ্বর্য্য

ভগবানের—ভগবন্ময় হওয়ার ফলে, সাধকের আধারে ভগবানই অবতরণ করেন। সৃষ্টির তো ইহাই পরম লক্ষ্য।

আত্মসমর্পণ যোগীর নিজের কোন প্রয়োজন থাকে না। ভগবানের হাতে আপনাকে ছাড়িয়া দেওয়ায়, অহঙ্কার আমূল উৎপাটিত হয়। ভগবানের প্রয়োজনেই তাহার প্রয়োজন, ভগবানের ইচ্ছা-পূরণের জন্যই তার জীবন। এই হেতু মুক্তি, মোক্ষ, অণিমাদি ঐশ্বর্য্য সে তুচ্ছ মনে করে। এই সকল প্রাপ্তির কামনাও যে কামনা—কামনা থাকিতে পূর্ণ যোগের দীক্ষা হয় না। কামনার ক্ষেত্রে এই যোগের স্ফূর্ত্তি নাই; উৎকট চেষ্টা বা কঠোর কৃচ্ছ্র-সাধ্য তপস্যাই যোগের নামে সেখানে প্রকাশ পায়। কিন্তু ভগবানের প্রয়োজন অথবা কামনার দায়, ইহা নির্ণয়ের উপায় কি? আত্মবাসনার সঙ্কেত ঈশ্বরের নামের শীলমোহর আঁটিয়া সাধককে যদি প্রবঞ্চিত করে, তাহা বুঝা যাইবে কেমন করিয়া?

যোগের পথে না আসিলে এই প্রশ্ন স্বাভাবিক। ভগবানের নামে প্রকৃতির ছলনায় যে বিমূঢ়, সে তো অসিদ্ধ জীবন-ভার বহিয়া মরিবে, ইহার উপর আর

কথা কি? আত্মকাম চরিতার্থতার হেতু, নিজের অহং-এর নাম না করিয়া, এইরূপ ক্ষেত্রে ভগবানের নাম করা অহঙ্কারকে চিনির মোড়কে ঢাকা দিয়া আত্মপ্রবঞ্চনা— ইহা লইয়া তর্ক বিতর্কের প্রয়োজন নাই। ঈশ্বরেচ্ছা-পূরণের জন্য যে সন্ন্যাসী, সর্ব্বত্যাগী, তার আধারের সর্ব্বাংশে ঈশ্বরের অনাহত শক্তিই অবতরণ করে। ঈশ্বর স্বয়ং সেখানে আত্মপ্রকাশ করেন। ইহা বড় সহজ নহে। যুগে যুগে ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্যই এই লীলার প্রকটন। আত্মসমর্পণ যোগের অধিকারী তাই কল্প-নির্দ্দিষ্ট বীজ বুকে লইয়াই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে।

ভগবান যে কেবল ধর্ম্ম স্থাপনের জন্যই অবতরণ করেন, আর অধর্ম্ম প্রচারে সয়তানকে প্রেরণ করেন, এমন নহে। উভয়ই তাঁর লীলা। তিনি সর্ব্বময় কর্ত্তা। দিবসের আলোকের মত, ভাগবত চেতনার স্বপ্রকাশ ধর্ম্ম নামে খ্যাত। অধর্ম্মের রূপ—দুঃখ, পীড়া, অত্যাচার, অনাচার, স্বার্থপরতা প্রভৃতি একপ্রকার বৃত্তি; ইহার বিপরীত সত্য, প্রেম, জ্ঞান, ভক্তি, উদারতা প্রভৃতি অন্যরূপ বৃত্তির আবির্ভাব। সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার তিরোহিত হয়, ধর্ম্মবৃত্তির অভ্যুদয়ে অধর্ম্মের

বিনাশ হইয়া থাকে ; অর্থাৎ বিপরীত বৃত্তিগুলি তখন সংহৃত হয়। তিনিই পাপ, তিনিই পুণ্য ; তিনিই অত্যাচারী, তিনিই আবার ভবভয়হারী ত্রাতা, দয়ার অবতার ; তিনিই হিংস্রক কালসর্প-রূপে দংশন করেন, আবার ধন্বন্তরী বেশে মুমূর্ষুর জীবন রক্ষা করেন। তিনি অদ্বয় তত্ত্ব-বস্তু, পরব্রহ্ম, পূর্ণ অনন্ত এবং যুগপৎ অংশ-রূপে অসংখ্য কোটী জীবের অন্তর্য্যামী আত্মা, আবার রসঘন, পঞ্চতত্ত্ব-সমন্বিত, সুগঠিত, নবজলধর-কান্তি কৃষ্ণ-মূর্ত্তি,—তাঁর সীমা খুঁজিতে খুঁজিতে সৃষ্টি স্থির হইয়াছে বহুবার, কিন্তু সেই অসীমের সন্ধান সে পায় নাই। যেখানে তিনিই ধরা দিয়াছেন, সেইখানেই শ্রীমূর্ত্তি প্রকট হইয়া, 'আপনি আচরিয়া' আপনার লীলা প্রকাশ করিয়াছেন।

এই ভাগবত তত্ত্ব সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, দীক্ষার প্রয়োজন। পূর্ব্বে দীক্ষাকেই বস্তু-নিরূপণ বলা হইয়াছে। কথাটা নূতন নয়। শাস্ত্রে তিন প্রকার দীক্ষার উল্লেখ পাওয়া যায়।

প্রথম—শাম্ভবী দীক্ষা। এমন এক মানুষের আশ্রয় পাইলাম, যাঁহার দর্শনে, স্পর্শনে ও বাণী শ্রবণে

অন্তর উদ্বুদ্ধ হইল, আর সে উদ্বুদ্ধতা জীবনে ছাড়া গেল না, জীবনের সব বৃত্তি সংহৃত হইয়া ঈশ্বরমুখী হইয়া পড়িল। কত কদর্য্য অভ্যাস, জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার উদয় হওয়া মাত্র লয় পাইয়া যায়, চেষ্টা করিয়াও অধোমুখী যাত্রায় পা সরে না—কে যেন জোর করিয়া, শনৈঃ শনৈঃ উপরের দিকে টানিয়া তুলে। দীক্ষা দান বা গ্রহণের কোনই সঙ্কল্প ছিল না, কিন্তু বস্তুতঃ এইরূপ ঘটিয়া গেল। এই শাম্ভবী দীক্ষা বড় অল্প জনের ভাগ্যে ঘটে।

দ্বিতীয়—শাক্তী দীক্ষা। আচার্য্য শিষ্যের পূর্ণ স্বীকৃতি গ্রহণ করিয়া, অধ্যাত্ম-শক্তি সঞ্চারে তাহার ভিতর দিব্য জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়া দেন। এ ক্ষেত্রেও মন্ত্র বা কোন আচার অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না। গুরু-সঙ্গই ইহার একমাত্র প্রকরণ। আচার্য্যের হৃদয়ে করুণার উদ্রেক হইলেই, শিষ্য ধীরে ধীরে অধ্যাত্মশক্তি-সম্পন্ন হইয়া উঠে।

পরিশেষে—মান্ত্রী দীক্ষা। মন্ত্রের সাহায্যে, নানাবিধ আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া শিষ্যের মনে ঈশ্বরানুরাগ জাগ্রত করার প্রয়াস—এই দীক্ষার সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ।

ইহাই বর্ত্তমান সমাজে সুপ্রচলিত। উপরোক্ত শাম্ভবী ও শাক্তী দীক্ষা অসাধারণ বলিয়া সহজ জীবনে উহার মর্ম্মবোধ হয় না। কেন না, উহাদের সাধন-নীতি শাস্ত্রাচার ও লোকাচার হইতে অনেক বিষয়ে ভিন্ন; কিন্তু সিদ্ধ বলিয়া যাঁহারা প্রসিদ্ধ, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এই দুই দীক্ষার দ্বারাই কৃতকার্য্য হইয়াছেন। আত্মসমর্পণ যোগের ইহাই গোড়ার কথা, বীজ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বস্তু-নির্দ্দেশের পরই সম্বন্ধ স্থাপনের কথা। জীবের একমাত্র সম্বন্ধ ভগবানের সহিত স্থাপন করা—ইহা সাধিবার বস্তু। তনু, মন, ধন দিয়া সম্বন্ধ স্থাপন না হইলে, অন্তরঙ্গ সাধনের রস মিলে না। তাই "ছিনু গৃহবাসী, করিলি সন্ন্যাসী" বলিয়া, প্রবর্ত্ত সাধনায়, নবদীক্ষিত সাধক অনেক মায়াশ্রু বিসর্জ্জন করে।

প্রাকৃত জীবনের স্তরে চেতনার স্থিতি যতদিন, ততদিন তার ভগবান প্রাকৃত—হয় ত শুধুই রক্তমাংসের ঢিপি অথবা প্রস্তর মৃত্তিকার সমষ্টি। প্রকৃত রহস্য —অপ্রাকৃত ক্ষেত্রে উঠিয়া অবগত হইতে হয়।

অপরোক্ষানুভূতির কোটায় গিয়া চেতনা না পৌঁছিলে, ঈশ্বর-দর্শন হয় না, এইজন্য ভগবান ভক্তকে ঐশ-রূপ দর্শন করাইবার পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন—

"ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টু মনেনৈব স্ব-চক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥"

ভগবানের ইচ্ছায় দিব্যচক্ষু উন্মিলিত হয়। মানুষের চেষ্টায় যে দর্শন, অনুভূতি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা কাল্পনিক; তাই চিনির লোভে আমরা নিম খাইয়া আপ্‌শোষ করি। বলিয়াছি—আত্মসমর্পণ-যোগীর চেষ্টা নাই, ঈশ্বরের হাতে আপনাকে উৎসর্গ করার জন্য যেটুকু প্রয়াস করার প্রয়োজন, যোগ গ্রহণের পূর্ব্বে সেইটুকুই দেখা যায়, তারপর নিজের হাত আর কিছু থাকে না। হাতের ঢিল ছুঁড়িয়া দিলে যেমন তাহার উপর আর কথা নাই, আত্মসমর্পণের দীক্ষা অবিকল এইরূপ।

সাধের ঘর পুড়িয়া ছাই হয়, বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যায়, কিন্তু হাত নাই! ভগবানের শক্তি বুঝাইয়াও কাজ করে না। হয় তো এই বুদ্ধি তাঁর পথের মর্ম্ম বুঝিতে পারে না,

অনেক চেষ্টা করিয়া সে হাল ছাড়ে, লোকে বলে "পাগল হ'লো"—সাধারণের এইরূপ মন্তব্য একান্ত ভিত্তিহীন নহে, সাধক নিজেই বলে "আমায় দে মা পাগল ক'রে, আর কাজ নেই তোর জ্ঞান বিচারে"—তা অন্যে পরে কা কথা!

বাহিরে নিঃস্ব হইয়াই চেতনা অন্তর্দ্দেশে স্থির হয়; এ-রূপে সে-রূপে কত প্রভেদ তখন দেখা যায়। সেখানেও সে পায় পঞ্চরস, কিন্তু তাহা অপ্রাকৃত; মরণের স্পর্শ নাই, সীমার বাঁধন নাই, হারাইবার আশঙ্কা নাই। এ-রূপ স্থান কাল ভেদে মলিন হয়, সে-রূপের তুলনা নাই—যেন শতকোটী চন্দ্র নিংড়াইয়া রূপের ছটায় দিক্ দেশ ডুবিয়া গিয়াছে, যেমন স্নিগ্ধ তেমনই মনোহর! আর ধ্বনির গুঞ্জন—শ্রবণ সে সুরে দ্রব হইয়া একাকার হইয়াছে! এইরূপ পঞ্চরসের মাধুরী অপ্রাকৃত অনুভূতির সাহায্যে সাধক যতক্ষণ না ধরিতে পারে, ততক্ষণ তার ভাগবত সম্বন্ধ সুদৃঢ় হয় না। এই সম্বন্ধ-তত্ত্বের উপর ভিত্তি করিয়া, একদল নূতন মানুষ নবজাতি গঠনের উদ্যোগ করিতেছে। ইহাদিগকেই আমরা ঈশ্বরকোটীর থাক্ বলিয়া বিশ্বাস করি। এই নব মানুষের মণ্ডলী

সঙ্ঘমূর্ত্তিতে যেদিন আত্মপ্রকাশ করিবে, সেইদিন নব বৃন্দাবনে, নূতন রাসোৎসবে এ জাতি ধন্য হইবে। সে দিন অদূরাগত—মরণ-কাতর জাতির ইহাই একমাত্র আশা।

৩

প্রয়োজন আস্বাদ—শাস্ত্র, সাহিত্য, উপদেশে কি হইবে? চাই আস্বাদ। ঈশ্বরপ্রাপ্তির পিয়াস—বিনা আস্বাদে তৃপ্ত হয় না। সে আস্বাদ, সে

"মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো-
র্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো,
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥"

কোথা সেই মধুর হইতে সুমধুর, তাহা হইতে আরও মধু আস্বাদ, সে কোন্ লাবণ্যপুর, অধর মধুরে সুকর্পূর স্মিতকিরণ যেথায় ঝরিয়া পড়ে—সে সঙ্কেত, সে তত্ত্বের নির্দ্দেশ কে দিবে?

গুরু—সকল অহংকার ঠেলিয়া মাথা যেখানে নত হইয়া পড়ে। এমন মাথা না মুড়াইলে, তত্ত্বের অধিকার জন্মে না।

সাধনার মূল—এই গুরু-তত্ত্ব। তত্ত্বের বিকৃতি আছে, তাই বলিয়া সত্যকে অস্বীকার করা চলে না।

গোড়ায় গলদ রাখিয়া, সাধনার পথে আগাইয়া যাওয়ার প্রয়াস অহমিকার নিরর্থক প্রচেষ্টা। এ জ্ঞানটুকুও যাঁর আশীর্ব্বাদে—তিনিই গুরু। "গুরুবক্ত্রে স্থিতং ব্রহ্ম," গুরুর বাণী—ব্রহ্মবাণী। তাই

"গুরুকে মানুষ জ্ঞান করে যেই জন।
দারুণ নরকে সেই হয় নিপতন॥"

সত্যই গুরু তো মানুষ নহেন, অখণ্ড মণ্ডলাকারে বিশ্বসংসার যিনি ব্যাপ্ত করিয়া আছেন, সেই নিত্য নিরঞ্জন নারায়ণ গুরুরূপে ভূমে বিচরণ করেন। জীবের শ্রদ্ধাভক্তির উৎস গুরুর চরণ ভজনেই উৎসরিত হয়, তাই গুরু ব্রহ্মে ভেদ নাই। নরে নারায়ণ প্রতিষ্ঠার এই তপস্যাই দেবজন্মের সত্য সূচনা।

মনে রাখিতে হইবে—সাধনা মানুষের মনের মত সাহিত্য-রচনা নয়। কবি গাহিয়াছেন—

"তপস্যার বলে একের অনলে
বহুরে আহুতি দিয়া,
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল
একটী বিরাট হিয়া।"

সে নিত্য মণিময় কোটায়, যেখানে ভেদহীন শ্রীক্ষেত্র-

তীর্থের জয়ধ্বজা মহামানবের একাত্মসাধনার বিজয় ঘোষণা করে, সে সাধনা আরাধনার যজ্ঞশালায় আনত শিরেই প্রবেশ করিতে হয়। মর্ম্ম পুড়িয়া ছাই হয়, উৎসর্গের হোমানলে দুঃখের রক্তশিখা লক্ লক্ করিয়া মরণের ডাক তুলে—শরীর রোমাঞ্চিত হয়, ধমনী শিহরিয়া উঠে। কিন্তু আতঙ্কের কথা সাধনার গোড়ায় বলিয়া রাখাই ভাল, অনর্থক পাঁয়তাড়া কষিয়া লাভ নাই। যোগ—বিনা দীক্ষায় আরম্ভ হয় না। সে দীক্ষার দক্ষিণা আত্মদান। উৎসর্গের বলিরূপেই সাধককে গুরু-রূপী নরদেবের চরণে আপনাকে লুটাইয়া দিতে হয়।

আত্মসমর্পণযোগে হেঁয়ালী নাই। কোথায় আত্মসমর্পণ করিব, কাহার কাছে করিব, ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার, এই সকল প্রশ্নের উত্তর শাস্ত্রের ব্যাপক বিধি—কিন্তু ঠাকুরের কথায় বলি, পাঁজীতে দশ আড়া জলের কথা লেখা থাকিলেও, নিঙ্ড়াইলে এক বিন্দু মিলে না; সেইরূপ যাহার যেমন মন, শাস্ত্রবচন তাহার তেমন সান্ত্বনার প্যানেসিয়া, সর্ব্ব-রোগের মহৌষধ, উহা সংশয়পাপ ছিন্ন না করিয়া অবস্থা আরও জটিল করিয়া দেয়।

দীক্ষার পর সাধনার কথা। সাধ্য বস্তু কি, তাহাই হয়তো অনেকের জানা নাই। গুরুমুখী করিয়া সাধনা করার কথা প্রকাশ করিতেও বাধে; কেন না, মানুষের অহমিকা এমন প্রবল হইয়াছে যে, গুরু-শব্দ উত্থাপন করিলেই অনেকে কাণে আঙ্গুল দেন। ইহা অকারণ নহে। কিন্তু কালধর্ম্মে শুধু গুরুবাদ কেন, সর্ব্ব তত্ত্বেই বিকৃতি দেখা দিয়াছে—নকলের দায়ে তাই বলিয়া কি কেহ আসলে বঞ্চিত হয়! ইহা যেন চোরের উপর রাগ করিয়া ভূঁয়ে ভাত খাওয়ার মতই মূর্খতা।

মূলের এই অন্ধতা অহঙ্কারকেই নূতন রূপে বর্দ্ধিত করে। ঘুঁড়ি উপরে উড়িলেও সূতা নীচের মানুষের হাতে থাকায়, এক গোঁতে উহাকে যেমন নীচে নামাইয়া আনা সহজ কথা; তদ্রূপ আত্মপ্রচেষ্টার জোরে সাধকের উর্দ্ধগতি এক নিমেষেই নীচে নামিয়া পড়িতে পারে। এ পতনের আর পুনরুত্থান নাই। সাধকের সাধ্য কি? উহা বুঝিলেই, গুরুর অনিবার্য্য প্রয়োজন অনুভূত হইবে।

এই যোগের উদ্দেশ্য লয় নয়, পরন্তু লীলা—এই মূল কথাটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখা চাই। সাধনার ইহা একটি বিশেষ ভঙ্গী। যাঁহারা লয় চাহেন, ঈশ্বরে পরনির্ব্বাণ

চাহেন, তাঁহাদের তুরীয় সত্তায় উৎসর্গ বিশেষ বিপজ্জনক নহে ; তবে সে ক্ষেত্রেও উত্তরসাধক-রূপে সাহায্যকারী গুরু অথবা পথপ্রদর্শক নেতা চাই। এই পথ বিরক্ত সন্ন্যাসীর জন্য। বাংলার তরুণ চায়—দিব্য নির্ম্মাণ, স্বর্গ-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা। তাই বাঙ্গালীকে বাংলার সহজিয়া, তন্ত্র অথবা বৈষ্ণব প্রবর্ত্তিত সাধন-পথের পথিক হইতে হইবে। বৈদিকের ঘরে বাংলার প্রাণ শান্তি পায় নাই, কোন কালে পাইবে না। তাই আত্মসমর্পণের কথা নূতন করিয়া শুনিবা মাত্র বাংলায় নবজীবনের হিল্লোল দেখা দিয়াছিল ; তারপর অর্দ্ধপথে আগাইয়া আত্মানুভূতির অভাবে গতিরোধ ঘটিয়াছে। অহঙ্কারের একান্ত নিরসন না হইলে, বিপথ আশ্রয় স্বাভাবিক। অহঙ্কার সত্যানুভূতির বাধা। সে বাধা—অধ্যাত্মভূমি যত দৃঢ় করিয়া তোল, উহাকে ভাঙ্গিয়া দিবে। চেষ্টা যোগের অন্তরায়। আপনার জ্ঞানের উপর ভর দিয়া সাধনার পথে আগাইতে যাওয়ায়,আত্মচেষ্টা প্রবল হয়। জ্ঞানবৃদ্ধি ঘটে, রসসৃষ্টি হয় না। সাধনায় রসোদ্গার না হইলে,কৃচ্ছ্র,তায় জীবন মুষড়াইয়া পড়ে। মানুষ চেষ্টা করিয়া কতদূর চলিবে ? এ পথের কি অন্ত আছে ? যে রসে কণ্ঠে

আনন্দের গান ফুটে, তেমন সাধনা গুরুমুখী না হইলে মিলে না কেন, সেই কথাই বলি।

মানুষের সম্পদ্—দেহ, প্রাণ আর মন। এই বিষয়-গুলি লইয়াই তো আমরা বিষয়ী। এই বিষয়ের প্রভাব প্রতিপত্তির উপরে ভর করিয়া আমরা সংসার করি, সমাজে রাষ্ট্রক্ষেত্রে আগাই, এই বিষয়ের জোরেই ভগবানকে পাইতে চাই—কিন্তু কেহ কি শরীর,প্রাণ, মনের বলে ঈশ্বর লাভ করিয়াছে? বরং এই তিনের জ্ঞানই মানুষকে কলুর বলদের মত ঘুরাইয়া মারে। ইহার সহিত সম্বন্ধ ছেদ করিয়াই সাধককে আগাইতে হয়—ঈশ্বরের পথে। তবেই দেখিতে হইবে—কি দিয়া ঈশ্বর-প্রাপ্তি হয়? সে বস্তু কি? উহা কি দেহ, প্রাণ, মনের সামগ্রী?

না—নবদ্বীপের শ্রীগৌরাঙ্গ, হালিসহরের রামপ্রসাদ, দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর দেহ, প্রাণ, মনের দানে অমরত্ব লাভ করেন নাই। এই সকলের অতীত সামগ্রী অর্জ্জন করাই সাধনার প্রথম কথা। বৈষ্ণব কবি বলেন ঃ—

"যাহাতে হইতে স্বয়ং ভগবান হয়।
সেই বস্তু সাধে ভক্ত জানিহ নিশ্চয়॥"

এই বস্তু সাধিয়া বাহির করিতে হয়। কায়মনোবাক্যে এক হইয়া ইহার সাধন করিতে হয়। ঈশ্বর-সাধনা যে বস্তু দিয়া করিতে হইবে, সেই বস্তুলাভের অধিকারী না হইলে, পড়া পাখীর মত ভগবানকে ডাকা শুনিতেই কৌতূহল—প্রকৃত আস্বাদ সে নিজেও পায় না, পরকেও দিতে পারে না। ধর্ম্ম-সাধনার ক্ষেত্রগুলি নামেই বিকায়, অধ্যাত্ম আস্বাদের উৎস নয়।

এই শরীর, প্রাণ, মনের মন্থনে সাধ্যের উৎপত্তি। সাধ্যবস্তুই ঈশ্বরপ্রাপ্তির সাধনা করে। উপাসক ভিন্ন এ তত্ত্ব বুঝা বড় শক্ত। দেহ, প্রাণ, মনের যেমন তপস্যা চাই—সাধ্য বস্তুরও তাদৃশ তপস্যা আছে। দেহ, প্রাণ, মনের পূর্ব্ব প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে, এই দশা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

প্রাকৃত জ্ঞান থাকিতে, অপ্রাকৃত বস্তুর সৃষ্টি হয় না। প্রাকৃত জ্ঞান লুপ্ত করিবার জন্যই বাহ্যবস্তুতে ঈশ্বর-তত্ত্বের আরোপ। আত্মসমর্পণ—দেহ, প্রাণ, মনের সম্যক্ শুদ্ধি-বিধানের যোগ। ইহা সাধনার চরম কথা নহে। তবে ইহার ভিতর দিয়া প্রত্যেক সাধককে চলিতে হয়। জড় অহং দূর করিয়াই সূক্ষ্ম সাধ্যবস্তু লাভ

করিতে হইবে। সে অহং-নিরসনের সনাতন নীতি—আত্মসমর্পন।

বলিয়াছি, সাধনার তিনটী অবস্থা—প্রথম আত্মসমর্পণ, দ্বিতীয় প্রকৃতি-সাধনা, তারপর সিদ্ধি। বাহ্যবস্তু ধরিয়াই বাহ্যদশার অন্ত হয়। প্রকৃতি-সাধনায় সাধকের অর্দ্ধ-বাহ্য অবস্থা হয়। আত্মসমর্পণ যোগে যে বস্তু বাহ্যে আরোপ করিয়া আপনাকে ঢালিয়া দেওয়া হয়, সেই বস্তুর সাধনে বাহ্যত্যাগ হইতে থাকে, অথচ এই স্তরে উপরেও স্থির থাকা যায় না। সিদ্ধ জীবনের একান্ত অন্তর্দ্দশা। অর্দ্ধ-বাহ্যদশায় যেমন বাহিরে বিরক্তভাব, এই অবস্থায় তাহা হয় না। বাহ্যান্তর-ভেদ ঘুচিয়া যায়,সর্ব্ববস্তুতে আত্মদর্শন ঘটে; অর্দ্ধবাহ্যদশার মত, কোন বিষয়েই ঔদাসীন্য থাকে না। জীবন দিব্য ছন্দোময় হয়।

এই সিদ্ধ জীবনের গোড়ার কথা—আত্মসমর্পণ। নীচের টানকে উপরে উঠাইয়া, উহা ভাগবত প্রবাহ-রূপে সৃষ্টি করার ইহা সিদ্ধ-নীতি। সেইখানেই যদি চুরি হয়, অহংকার বাঁচিয়া যায়; তাহা হইলে আর নবজন্ম লাভের আশা কোথায়?

বাংলায় যে সকল সিদ্ধ মহাপুরুষ জন্মিয়াছেন,

তাঁহাদের হৃদয়ে নাচিয়াছে সেই রতি, বহিয়াছে সেই রস—যে রতি, যে রসে ভগবানের অবতরণ ঘটে। তাই না স্বামীজী চাহিতেন, "হৃদয় শ্মশান হোক, নাচুক তাহাতে শ্যামা"—এই শ্যামার ছন্দেই ত ভগবান ধরা দেন। ধ্যানে, মন্ত্রে, কৃচ্ছ্রতায়, তিনি দূরেই সরিয়া পড়েন। কথায় বলে—

"সাক্ষাতে আছয়ে তাহা, ধ্যানে সিদ্ধ নহে"

সত্যই যে রসে, যে রাগে, যে স্বরূপে তাঁর স্থিতি, সাধনায় তাহার আস্বাদ যদি না মিলে, সেই তত্ত্ব যদি জীবন ছাইয়া না ফেলে, মানুষের ডাকাডাকি কলরব মাত্র। এ চোখের পরদায় যে তত্ত্বের চাহনি খেলিবে, কণ্ঠে যে সুরের মূর্চ্ছনা তুলিবে, গণ্ডে যে অশ্রু ঝরিবে—সেই তত্ত্বই প্রথম সাধ্য। সেই সাধ্য—সে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি-রূপা, প্রেম-রূপা মহাকালী, মহারাধা যদি নাচে এই বুকে, এই হৃদয়ের রাসমন্দিরে—তবেই তো সিদ্ধি, তবেই তো জীবন কৈলাস, বৃন্দাবন, স্বর্গধামে পরিণত হইবে! জীব সামান্য, কিন্তু গুরুর আশ্রয়েই সে আপনার মধ্যে দিব্য প্রকৃতির সন্ধান পায়। সাধ্য-রূপে এই প্রকৃতি যেদিন জীবনকে কেন্দ্র করিয়া, ভাগবত লালসায় উদ্বুদ্ধ

হন—তখন মর্ত্ত্যের বুকে হাজার গৌরাঙ্গ, হাজার রামকৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটে। সে তত্ত্বের মর্ম্মোদ্ভেদ যাঁহার করুণায় সম্ভব হয়, সেই গুরু-রূপী মহাদেবতার চরণেই বাংলার লক্ষ লক্ষ সাধককে একনিষ্ঠ তপস্যায় আত্ম-নিয়োগ করিতে বলি। বাহিরের চেষ্টা বাহিরে রাখিয়াই নিগূঢ় সাধনতত্ত্বের অধিকারী হইতে হয়—এই কথা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই।

সাধনে যাহা ভাবিব, সিদ্ধ দেহে তাহাই পাইব—সাধন অবস্থায় সাধ্যবস্তু অপক্ক, তাহাই সিদ্ধ অবস্থায় পরিপক্ক হয়। তবেই তো আস্বাদের কথা। ইহাই ভুক্তি।

সাধকের ভাবিবার সামগ্রী কি? চক্ষের সম্মুখে দুই চারি খানা শাস্ত্রগ্রন্থ খুলিয়া ধরিলেই তো সাধনার ধন মিলে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই নূতন যোগ ধ্যানসিদ্ধ নয়। আগে পাওয়া, তবে তো তাহার দিকে চাহিয়া থাকা, তবে তো "জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু, নয়ন না তিরপিত ভেল"—আঁধারে হাতড়াইয়া বস্তুর সন্ধান মিলে না। চক্ষু বুজিয়া বসিয়া থাক কাহার জন্য, হিয়ায় কাহাকেও পাইয়াছ কি? একটা ভাব, এক বিন্দু রস, যদি কিছুই না হৃদয়ে পরশ দিয়া থাকে, তবে জীবন-মরুভূমির মাঝে মরীচিকা-ভ্রান্ত ভাগ্যহীন পথিক্, তুমি বিনাশের পথে ছুটিয়াছ।

সাধনার যে তিনটী অবস্থার কথা বলা হইয়াছে, এ

ছাড়া অন্য পথ নাই। প্রবর্ত্ত দশায়, সাধক নর-নারায়ণ শ্রীগুরুর হস্তে যন্ত্রবৎ পরিচালিত হয়। ইহাই আত্ম-সমর্পণের অবস্থা। আত্মসমর্পণ-সাধনার মর্ম্মকথা আর কিছুই নয়—একান্ত আনুগত্য। সৌভাগ্য-বশে, এ যুগ যে পার হইয়াছে, সে সাধক। অনুগত হইয়া আশ্রয় আস্বাদনে তার দেহ প্রাণ মনের বাঁধন খুলিয়াছে; সাধিয়া সে বাহির করিয়াছে সুর—এ সুর বাধা মানে না, কারু নিষেধ শুনে না, কেমন করিয়া এ প্রবাহ-রোধ হইবে! উপরের অনাহত সুর জীবন-যন্ত্রে নিত্য ঝঙ্কার দিতে চায়। বাধে—শরীর, প্রাণ, মনের গাঁটে; সে গ্রন্থী যদি ফাঁক হইয়া যায়, ফুৎকারে ফুৎকারে নব নব সুরে জীবন মাতিয়া উঠে। সাধে কি সাধক পাগল হয়, মরণের বেড়ী স্বেচ্ছায় পায়ে জড়াইয়া থাকে! মনগড়া সমাজের মাপকাঠিতে আর তার আচার আচরণের মাপ হয় না। উর্দ্ধফণা অত্যাচার মাথা উঠায়, নিষ্ঠুর আঘাতে সাধকের বাহ্যদশা ঘুচাইয়া দেয়, তখন "নির্ব্বিকার হয় প্রেম না থাকে বিকার।"মনে রাখিতে হইবে—এই প্রেমই সাধ্যবস্তু। গৌণবস্তু ধরিয়া সাধক সাধনা করে না, অর্থাৎ শরীর প্রাণ মনের মন্থনে,

ভগবানের ভজনা প্রবর্ত্ত সাধনার অঙ্গ। বাহ্যে দুই রূপের আভাস থাকিলেও, সাধকের অন্তরে আত্মার অক্ষয় রূপই ভাসিতে থাকে।

প্রেমের সত্য আশ্রয়—এই দেহ, প্রাণ, মন নয়। বিশুদ্ধ রতি ইহাদের সংস্পর্শে মলিন হইয়া পড়ে। আমরা যে ভালবাসি, সে ইহার তুলনায় কি উপমা দিব খুঁজিয়া পাই না! এই ধারণা কর—যে মকরন্দ লোভে ভগবান ঝুঁকিয়া পড়েন, নরদেহ আশ্রয়ে অবতীর্ণ হন, সে চির অপার্থিব ধন। এ ধনের অধিকারী যে নয়—তার আরাধনা, সাধনা পণ্ডশ্রম, অন্যের অনুকরণ মাত্র। এ স্বর্গের পারিজাত মর্ত্ত্যে ফুটাইবে কে?

আত্মসমর্পণ যোগী। আত্মসমর্পণ করিতে হইবে—মন দিয়া। সকল ইন্দ্রিয়ের শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয় মন। তোমার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে পৃথিবীর কলুষ, তাই ইহা পরবশ। কাঁটা দিয়া কাঁটা বাহির করার কৌশল এ ক্ষেত্রে প্রযুজ্য। মনকে এমন একজনের অধীন করিয়া দাও—যাহার চাপে পূর্ব্ব অধীনতার অভ্যাস ও সংস্কারের নিরসন হয়, একটা নূতন অভ্যাস ও নূতন সংস্কার জাঁকিয়া বসিতে পারে। এইরূপ হইতে থাকিলে,প্রথমে দারুণ অস্বস্তি বোধ হয়;

বহুদিনের পরিচিত সামগ্রীর সহিত বিচ্ছিন্ন হওয়ায়, শরীর প্রাণ মন অবসন্ন হইয়া পড়ে। সাধ করিয়া সাধনার পথে আসিয়া, ঠেলা দেখিয়া অনেকেই পিছাইয়া পড়েন। তাই মৃত্যু পণ করিতে হয়; শুধু মৃত্যু পণ নয়, পূর্ব্ব গোত্র পর্য্যন্ত ফেলিয়া দিতে হয়। যোগ একটা নূতন জীবন। যোগীর সমষ্টি—নূতন সমাজ, নূতন জাতির ভিত্তি। পুরাতনের সহিত জড়াইয়া জড়াইয়া যোগ হয় না। পূর্ব্ব অবস্থা-সমূহ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে ঢাকা পড়িয়া যায়; নিজের পিণ্ড নিজের হাতে দিয়াই নিজেকেই আন্‌কোরা নূতন করিয়া লইতে হয়। সাধনার পথে অগ্রসর হইতে অভিলাষী যাঁহারা, তাঁহারা যেন এই কথা স্মরণ রাখেন।

অনেকেই ভাবিতে পারেন—যাহারা সংসার ঘর লইয়া জড়াইয়া পড়িয়াছেন, তাহারা তবে উপায়হীন; সোজা কথায় বলি—শোধনের সাধনা ছাড়াইয়া, অথবা অল্প বিস্তর মানসিক উন্নতি বিধানের ব্যবস্থা ভিন্ন গৃহস্থ-লোকে সাধনার পথে অধিক দূর অগ্রসর হইতে চাহে না। ইহারও প্রয়োজন আছে; তাই সমাজে অসংখ্য প্রকার সাধন, ভজন, আরাধনার বিধি। তবে সংসারী

ব্যক্তি তার সমর্পিত সবখানিকে রূপান্তরিত করিয়া তোলার স্পর্দ্ধা যদি রাখে, তাহা হইলে এ পথ প্রশস্ত, কিন্তু খুব কঠিন। নিজেকে দেখার অবকাশ থাকে না, স্ত্রীপুত্রের হাত ধরিয়া চলার ধৈর্য্য রাখা সহজ কথা নহে। আমাদের পরিচিত অনেক গৃহস্থ এ পথে কিছু দূর গিয়া, পিছনের টানে আর আগাইতে পারিলেন না, —ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমরাও যোগকে সমষ্টি-শক্তিরূপে বরণ করিয়াছি বলিয়া ব্যক্তিগত গতিকে ক্ষিপ্র করিয়া তুলিতে পারি না। কিন্তু সান্ত্বনা এই, ব্যক্তির মুক্তি অপেক্ষা সমষ্টির মুক্তি দেশ ও জাতির অধিক কল্যাণ সাধন করিবে।

আত্মসমর্পণে—অনুগত্যের মার্জ্জনে, আধার নিরাময় হয়, অহঙ্কার খসিয়া পড়ে। এই জন্য যোগের উদ্দেশ্য—আর অন্য কিছু নয়, মানবতার মধ্য দিয়া ঈশ্বরের প্রকাশ, এই জীবনে ভগবানের অখণ্ড সত্তাটীকে মূর্ত্ত করিয়া ধরা।

যে স্বভাব, যে সংস্কার বশে জীবনের গতি, তাহাকে উল্টাইয়া ধরিতে হইলে, ভিন্ন অভ্যাস ও সংস্কারের আরোপ—আনুগত্যের উদ্দেশ্য। বর্ত্তমান স্বভাবের

বিরুদ্ধে দ্বিতীয় স্বভাবশক্তির দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়—দীক্ষায়। এই দ্বন্দ্বযুদ্ধ অসাধারণ ধৈর্য্য সহকারে ধরিতে হয়, আর নিরাসক্ত হইয়া ফলাফল দেখিতে হয়। কোন বিষয়ে আসক্তি রাখিলে, অহং-মুক্ত হওয়ার বিঘ্ন ঘটিবে। আত্ম-সমর্পণ যোগ গৃহীত হওয়া মাত্র সাধকের আর কিছু করিবার থাকে না। যদি মনে হয় কিছু করিতেছি, তাহা অশুদ্ধি, মনের সবখানি আশ্রয়তত্ত্বে উঠাইয়া দেওয়ার অভাব। সাধক এই ভাবের আঁচ্ পাইবা মাত্র সাবধান হইবেন।

আত্মসমর্পণ করা হইলেও, মনে যদি হয়—আমি করি-তেছি, তখন ইহা উপেক্ষা করার কথা নয়। এ সংশয়—মনকে নির্ম্মূল করিয়া যে উৎসর্গ করা হয় নাই, তাহার সন্ধান দেয়। সাধক অবহিত হইয়া অধিক শ্রদ্ধা সহ-কারে আশ্রয়-তত্ত্বের নিকট পুনঃ পুনঃ আত্মনিবেদন জানাইবে।

কেন না, আত্মসমর্পণের সাধনা জাগ্রত হওয়া মাত্র শ্রদ্ধার উৎস খুলিয়া যায়—সঙ্গে সঙ্গে সাধু-সংহতি ঘটিয়া থাকে, ভজনাশ্রয় অটল হয়। আশ্রয়-তত্ত্বই তো যোগীর আধারে ক্রিয়া করিয়া থাকে। সাধক ধ্যানও

করে না, জপও করে না—যাহা কিছু হয়, হৃদয়ে যাঁহাকে স্থান দিয়াছি তাঁহারই ইচ্ছায়। এইরূপ নিত্য স্মরণ রাখিয়া চলিতে পারিলে, শোধনের অদ্ভূত অদ্ভূত ক্রিয়া চলিতে থাকে। প্রয়োজন হইলে কোন ক্রিয়াই বাদ পড়ে না। কিন্তু আত্মসমর্পণ যোগী আপনাকে উৎসর্গ করিয়াই খালাস, সে সতত স্বতন্ত্র হইয়া সব দেখে। যেখানে নিজেকে কর্ত্তা মনে করে, সেখানেই সে গুরুশক্তিকে দ্রুত কর্ম্ম সাধনে বাধা দেয়।

দীক্ষা ঠিক ঠিক ভাবে সিদ্ধ হইলে, নীচেকার বাঁধন দুই উপায়ে খুলিতে থাকে। প্রত্যেক সাধক এই দুই উপায় ভিন্ন যেন তৃতীয় উপায় আবিষ্কার না করে। তাহা মনের জুয়াচুরি। সিদ্ধ মহাজনেরা যেরূপ অনুভব করিয়াছেন, আত্মজীবনে যাহা অনুভূত হইয়াছে, অকুন্ঠিত চিত্তে তাহাই প্রকাশ করিতেছি।

আত্মসমর্পণের পর, পুঁথিগত বিদ্যার অনুসরণ করিতে গিয়া, সাধক হয় দ্রষ্টা, প্রকৃতির কাজ দেখিয়া যায়। আত্মপ্রকৃতির উপর আরোপিত নূতন শক্তির মার্জ্জন-ঘর্ষণ-জনিত যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ, তাহাও মনের কল্পনার। ছায়ার সহিত মল্লযুদ্ধ করার মত, ইহা যোগের অভিনয়

মাত্র হয়, আসল যোগশক্তির সন্ধান পাওয়া যায় না। গুরু ও দীক্ষাকে তাই আমরা এত বড় করিয়া ধরিতেছি। চাই তো ঋতময় জীবন, অহমিকাকে প্রশ্রয় দিয়া বৃথা কালক্ষয়ে প্রয়োজন কি ?

শরীর, প্রাণ, মনের চাওয়ার উপর গুরুশক্তির চাওয়ার চাপ নিজের বাসনাকে প্রতিহত করে। তখন দুঃখ ক্ষোভের অন্ত থাকে না। জন্মলব্ধ শরীর, প্রাণ, মনের শক্তি নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এই নির্জীবতা অহং'এর ছলনা। নিজের বাসনা পূরণের জন্য আমি যতটা শক্তি প্রয়োগ করিতে পারি, দ্বিতীয় ব্যক্তির চাওয়াকে সার্থক করিতে সে বল বাহির হয় না। ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু গুরুশক্তি তো প্রাকৃত শক্তির মূলই কাটিতে চায়। তাই কর্ম্মসিদ্ধিই এ যুগে আসল কথা নয়। প্রাকৃত জীবন ছাড়াইয়া,যোগী অপ্রাকৃত জীবনের কতটা আস্বাদ পাইতেছে—তাহাই আসল কথা।

শোধনের এই উপায় ব্যতীত আর একটী উপায় আছে ; প্রত্যক্ষভাবে গুরুশক্তির চাওয়া অনেক ক্ষেত্রে না থাকিতে পারে, সেখানে প্রেরণাই শোধনের কাজ করে। নিজের চাওয়াকে দাবিয়া ধরিলেই দ্বন্দ্ব উপস্থিত

হয়, অগ্নিপ্রবাহের মত প্রেরণার আঘাতে অহমিকার অন্ধমূর্ত্তি গলিয়া পড়ে। সত্য তো অহঙ্কার নয়, উহা মায়া অবিদ্যা, টিপিয়া ধরিতে পারিলেই স্বরূপ বাহির হয়। সে স্বরূপ নিত্য—রূপ তার সৎ-চিৎ-আনন্দ, স্বভাব তার নিত্যমুক্ত। সাধন অবস্থায় ইহা ভাবমূর্ত্তিতে থাকে, সিদ্ধ দেহে মূর্ত্ত হইয়া উঠে।

আত্মসমর্পণের অবস্থায় আর একটা বড় সংস্কারের ক্ষয় হয়। শরীর, প্রাণ, মনের ক্ষোভ ভোগে শেষ হয় না তো! উপরের আলো নীচে নামিতে পারে না, তাই এইখানে সব বিষয়েই হাঁতড়াইয়া চলা হয়, কাজেই হিতে বিপরীত ঘটিতে থাকে। বল তো, পরতত্ত্ব ভিন্ন জীবের অন্য চাওয়া আর কি থাকিতে পারে? দীক্ষায় এই আকাঙ্ক্ষাই জাগ্রত হয়, জীবন-যন্ত্রের প্রতি কেন্দ্রের "বাঞ্ছিত-পূর্ত্তিতে" জীব নিস্তার পায়। এ কি কম করুণা! এই দেহ, প্রাণ, মনই তো ভাগবত প্রতিষ্ঠান; এইরূপ হইয়া উঠাই তো ইহাদের সত্যকামনা। তাই কামবীজের সাধনাই আত্মসমর্পণ যোগীর সাধ্য। যোগে কাম ঊর্দ্ধমুখী হয়।

ভজনে প্রবীণ হইলেই মনে শুদ্ধ সত্ত্বগুণ আপনা

হইতেই উপস্থিত হয়। তখন শুদ্ধ হৃদয় প্রকাশ হইয়া পড়ে। তোমরা যে পর-মনের কথা বল, উহা তোমার নিজেরই সত্য স্বভাব। এই মনের মার্জ্জনেই সে মনের স্বতঃপ্রকাশ সিদ্ধ হয়। সহজভাবের কার্য্য সফল করিতে কস্‌রত কি? প্রাপ্ত বস্তু নিষ্ঠায় চিত্তে জাঁকিয়া বসে, উদাসীন উদার চরিত্রে কিছু তো বিরুদ্ধ থাকিবে না। এ সকল কথা সাধক পর্য্যায়ে আলোচনা করিব।

এক্ষণে বলি, আমরা যে আত্মসমর্পণ যোগ প্রচার করিতেছি, তাহার একটা উদ্দেশ্য আছে। অজ্ঞানী অহঙ্কারী ইহার বিকৃত অর্থ করিবে, মনের খেলা, প্রাণের খেলা বলিয়া ব্যর্থ বাধা দিবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ সুর গলা টিপিয়া ধরিলে লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে মূর্চ্ছনা তুলিবে। এ যে ভগবানের বাঁশী, আত্মসমর্পণ যোগের পরম সিদ্ধি।

উদ্দেশ্য—ঐক্যবদ্ধজীবনে সংহতির প্রতি ব্যষ্টি ভাগবত চরিত্রের অধিকারী হইবে, ব্যাপ্ত করিবে নিজেদের জাতির মধ্যে—দিব্য জাতি-রূপে। লক্ষ্য যেখানে অস্পষ্ট, সেখানে নীরব থাকিতে হয়। উপর

হইতে যোগের অবতরণের সঙ্গে, চাওয়ার রূপটীও ফুঠিয়া উঠে—তাই না বলিয়া থাকাও যায় না। হে সাধক, বাধা তোমার পদে পদে, বাধাগুলিও ক্ষুদ্র নয়, তুচ্ছ নয়। বৃহতের পরখ ক্ষুদ্র শক্তির সামর্থ্যে কুলায় না, তাই বাধার হিমালয় তোমার সম্মুখে। কিন্তু ভয় নাই, অভী হও, যন্ত্রী যিনি তিনি আঘাতে আঘাতে যন্ত্র বাঁধিয়া লইবেন। সমর্পণ-যোগে এই যন্ত্রবোধের সিদ্ধিই পর পর্য্যায়ে সাহস দিবে, প্রত্যয় দিবে। পরতত্ত্ব তোমার লক্ষ্য, সন্তাপ পায়ের তলায় লুটাইবে। তুমি অগ্রসর হও। একটী পরশের টানে তুমি ছুটিয়াছ—

"অন্যের পরশ যেন, নাহি হয় কদাচন,
ইহাতে হইবে সাবধান।"

সে সুখের স্পর্শ অথবা দুঃখের স্পর্শ, সে নিন্দা প্রশংসা, যশ অপযশ যে কোন স্পর্শই হউক, কলঙ্কে তোমায় ঢাকা দিক্, তুমি গাও ঃ—

"ঘরে তো আর থাক্‌ব না শ্যাম,
সার করেছি তোমারই নাম।"
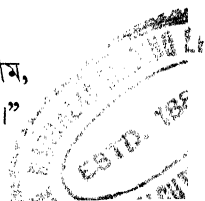
শুধু মনে রাখিও—কোন বাধায় তোমার পতন নাই —মনে রাখিও—

"নিরন্তর সুখ পাবে সকল সন্তাপ যাবে
পরতত্ত্ব করিলে উপায়।"

এই পরতত্ত্ব, এই পরম জীবনের আকাঙ্খা যেন মলিন না হয়—ইহাই এই যোগের মর্ম্মমন্ত্র।

*
* *

৫

উৎসর্গের মর্ম্ম-কথা—বিশুদ্ধ আত্মাতে আপনার সবখানিকে উঠাইয়া লওয়া। এই শরীর, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, এইগুলিকে গুটাইয়া, আত্মার মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া দেওয়া চাই। এই পরশ-রতনের স্পর্শে, সবখানি স্বর্ণ বর্ণে স্বতঃ-উৎসরিত হইয়া আবার প্রকাশ পাইবে। ইহা সত্যই একটা জন্মান্তর। যাহা আছে, তাহা দোষশূন্য নহে ; তাই ইহার একান্ত রূপান্তর সাধনের যে প্রয়াস, তাহার বড় অঙ্গ—শোধন।

আধার আদ্যাপ্রকৃতির লীলাভূমি। বাসনা সংস্কারে, অবাধ শক্তির প্রবাহ প্রতি পদেই রুদ্ধ ; জীবনের প্রতি গ্রন্থী তাই শুষ্ক, রসহীন। এই অমৃত-সঞ্জীবনীর মুক্তস্রোত শুদ্ধ জীবনেই সম্ভব ; সাধনার গোড়ায় শুদ্ধির উপর তাই অধিক ঝোঁক দিতে হয়।

আত্মসমর্পণ যোগীর শুদ্ধি-নীতি অন্যান্য সাধন-প্রণালী হইতে ভিন্ন ধরণের। বাহিরের দিক্‌টায় তাহার আদৌ দৃষ্টি নাই, সবখানি মন অন্তরের দিকেই ঝুঁকিয়া

পড়িয়াছে—বাহিরের ত্রুটি লোকের চক্ষে বড় বিকটরূপে ফলিয়া উঠে। তীব্র সমালোচনার সুর চারিদিক্ হইতেই তাহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তোলে—কিন্তু উপায় নাই। ত্রুটিগুলির কথা অগ্রে বলি।

হিন্দুজাতির মনে সাধন-বিধি যে ভাবে শিকড় গাড়িয়াছে, তাহাতে জীবনকে কি কি নিয়মে পরিচালিত করা হয়, তাহার দিকেই সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টি পড়ে। আহার সম্বন্ধেই অধিক কড়াকড়ি। ঈশ্বর-চিন্তার মধু-আহ্বান উষা আগমনের সঙ্গেই পাখীর ডাকে সাধকের কর্ণে পরশ দিয়া যায়, সুতরাং নিদ্রাত্যাগের নিয়ম মানিয়া চলায় আত্মপ্রকৃতির উপর জোর জবরদস্তি করিতে হয় না; কিন্তু আহার বিষয়ে নীতিমূলক উপদেশ একেবারেই অসহ্য। শরীর-পোষণের জন্য যাহা মিলে, তাহা ভোজন করাই প্রশস্ত। স্বামীজীও বলিয়াছেন—খাদ্যাদি ভাগ্য-বলে যাহা মিলে, তাহার উপর বিচার করিতে নাই। এমন কি, হবিষ্যান্নভোজী না হইয়াও জীবনে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করা যায়, আত্মসমর্পণ যোগের সাধক মাত্রেই তাহা অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারেন।

তারপর, জাতিবিচার-সমস্যা। শুদ্ধি-সাধনার ঐ

বিচার অধ্যাত্ম যোগ-জীবনে মানিয়া চলা অসম্ভব। যে জাতি, যে ধর্ম্মীই ঈশ্বর-সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন, তাহাদের একজাতি বোধেই গ্রহণ করিতে হয়। সর্ব্বভূতে ঈশ্বরানুভূতির ব্রত গ্রহণ করিয়া, জাতি-স্বাতন্ত্র্য মানিয়া চলা ভাবের ঘরে চুরি বলিয়া মনে হয়। আত্মসমর্পণ যোগে স্বজাতি-বিচার ভিন্ন পদ্ধতি ধরিয়া নিরূপিত হয়।

তবে এই যোগে শুদ্ধির বিধিটা কি? সেইটাই আমাদের বলিবার কথা। অধ্যাত্ম-সাধনা—সর্ব্বতোভাবে সর্ব্ববৃত্তিকে অন্তর্মুখী করিয়া রাখা। সকল রূপ—স্বরূপে মিলাইয়া, ভাবের ভাবনায় ডুবিয়া থাকা। কথাটা আরও সহজ করিয়া বলার দরকার।

শুদ্ধি—সাধনার অপরিহার্য্য অঙ্গ। এইজন্য এই সাধনার মর্ম্ম স্পষ্ট করিয়া বুঝিলে, শুদ্ধির নিয়ম অনায়াসে বোধগম্য হইবে। সাধনা—শরণ। কাহার শরণ?—সতের। সে সৎ আমার গুরু, আমার ঈশ্বর। এই সৎসঙ্গ যদি ভাঙ্গে, দুর্গতির সীমা থাকে না—কেন না আপনাকে না হারাইলে শরণ সার্থক হয় না। ইহা জীয়ন্তে মরণের ব্যবস্থা। এই মরণ বাঁটিয়া অমৃতের উৎপত্তি, দিব্যজীবনের ইহাই রসসিন্ধু। যাহার জন্য

মরা, তাহাকেই জীয়াইতে হয়, তাই সে মানুষ সহজ মানুষ নয়—তাহাকে চেনাও শক্ত কথা, অনেক বাধা এড়াইয়া লাখে এক এই মানুষে আশ্রয় মিলে।

প্রথম—ভাব। ভাব ঘন হইলেই মাধুর্য্যের সৃষ্টি। ঠাকুর বলিতেন—"তোর যেমন ভাব তেমনি লাভ, মূল সে প্রত্যয়।" ঈশ্বর-বিশ্বাস না থাকিলে ভাব হয় না, সম্বন্ধ পাতানও যায় না। বাঙ্গালীর সাধনা পূরণাত্মক। আত্মস্বরূপের পূর্ণ প্রকাশ—আশ্রয়ে আপনার সবখানি আরোপের উপরই নির্ভর করে। ভাবঘন মাধুর্য্যই প্রেম। যেমন ভাব তেমনি লাভ, এই লাভ প্রেম ভিন্ন অন্য কিছু নয়। সাধনায় পারের কড়ি অর্জ্জন করিতে হয়।

প্রেম—আনন্দের মূল। আত্মসমর্পণে প্রেমের উৎপত্তি। তোমার সহিত আমার ভাব না হইলে, প্রেমের আস্বাদ পাইব কেমন করিয়া? সে ভাব অনন্যমমতা-বিশিষ্ট হওয়া চাই।

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥"

ভগবানের প্রতি ভক্তের, পতির প্রতি সতীর,

ঈশ্বরের প্রতি সাধকের, মানুষের প্রতি মানুষেরও যদি এইরূপ নিষ্ঠাযুক্ত প্রেমের উদয় হয়, সে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ-ধারায় অভিষিক্ত সাধক নবজন্ম লাভ করে। তাই চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—

"প্রেমের মাঝারে—পুলকের স্থান
পুলক উপরে ধারা।
ধারার উপরে, ধারার বসতি
এ সুখ বুঝয়ে কারা॥"

এই প্রেম অতিশয় মমতাযুক্ত, অতিশয় ঘনীভূত। নৈষ্ঠিক প্রেমে অন্তঃকরণ সম্যক্‌রূপে নির্ম্মল হয়, তাই সেখানে পুলকের জন্ম। ঘনীভূত প্রেম দ্রব হয় পুলকের শিহরণে, ধারা-রূপে সাধকের অন্তর বিধৌত করিয়া দেয়। সে পৌষ মাঘ মাসের শিশির-কুম্ভ সর্ব্বাঙ্গে ঢালিয়া যে শীতল হইয়াছে, তার সুখের মাত্রা কে বুঝিবে? চণ্ডীদাসের কথাতেই বলি :—

"সম্যক্ কহিতে নারি বিদরে পরাণ।"

এ সাধনার পথে প্রধান বাধা—নিবৃত্তি। কোন ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির মুখ যদি ফিরাইয়া দেওয়া হয়, সহজ

গতি আর কোন দিন ফিরিবে না। সাধকের প্রত্যয় থাকা চাই, যে প্রবৃত্তি সহস্রমুখী হইলেও, গতির মূল উদ্দেশ্য—ঈশ্বরপ্রাপ্তি। এই প্রবৃত্তি ঈশ্বর-সাধনায় যুক্ত হইলে, উহাকে আর প্রবৃত্তি বলে না, তখন উহা রতির আকারে দেখা দেয়। প্রেমের গাঢ় রূপই রতি। পুলক-শিহরণ রতি-উদয়ের সূচনা। ঈশ্বরে রতি জন্মিলেই রসক্ষরণ হয়, ইহাকেই রতি-আস্বাদন বলে। অন্তরে বাহিরে পরম শুচি হইতে পারিলে সকলেই এই অবস্থা লাভ করিতে পারে।

এই শুদ্ধির জন্য কি ছুঁৎমার্গ অবলম্বন করিতে হইবে? ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলিকে বাহিরের নিয়ম সংযম পালনে সঙ্কুচিত করিতে হইবে? বৈদিক ধর্ম্মে পাতঞ্জলের সাধন-বিধির প্রয়োজন থাকিতে পারে—নবতান্ত্রিক বাঙ্গালী, তারা কেন পরধর্ম্মের বোঝা ঘাড়ে চাপাইয়া ন্যুব্জপৃষ্ঠ হইবে? স্বধর্ম্মে নিধন শ্রেয়ঃ না করিলে, আত্মার উদ্বোধন হয় কি? বাঙ্গালী আত্মধর্ম্মে দীক্ষিত হও—পদ্মাভাগীরথী-প্লাবিত পুণ্যতীর্থে সাধনার অভাব নাই; চাই আত্মপ্রত্যয়, ভাগবত লাভের সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা, ভজিতে ভজিতে নিগূঢ়ে অবধারিত পৌঁছিবে।

তবে কি আত্মশোধনের কোন ব্যবস্থা নাই ? আছে। সে যেরূপ ব্যবস্থা, সত্যই তাহা পালন করা যার তার কর্ম্ম নয়। কৌপীন এক দণ্ডেই গ্রহণ করা যায়, হবিষ্যান্ন ভোজন ইচ্ছা মাত্রেই হয়; কিন্তু আত্মসমর্পণযোগীর যে শোধননীতি—তাহা যেমন দুর্ব্বোধ্য, তেমনি কঠোর-সাধ্য। দুর্ব্বোধ্য—কেন না বুদ্ধি দিয়া, তাহা অবধারণের উপায় নাই; বুদ্ধিকে তলাইয়া, অবচেতনার স্তরেই এ তত্ত্ব ফলিয়া উঠে—আর কঠোর-সাধ্য এই জন্য, যে ইহার মধ্যে চেষ্টা করিবার কিছু নাই; যত্ন, শ্রম. কিছুতেই ইহা আয়ত্তে আসে না। তবে নব সাধকের সুবিধার জন্য ইহার কিছু সঙ্কেত দিতেছি।

শরণ যখন স্থির হয়, অর্থাৎ ভাবের ভাবনা যিনি, তাঁর হাতে সব ছাড়িয়া সাধককে নিশ্চিন্ত হইতে হয়। আশ্রয়ে সব কিছু উঠাইয়া দেওয়া চাই। এই সঙ্গ যদি ভাঙ্গে, সাধকের জীবন-সংশয় ঘটে। দীক্ষার পূর্ব্বে বিচারের অবসর—দীক্ষান্তে বিচার-বুদ্ধি থাকে না। বাহিরের দিকে ঔদাসীন্য দেখা যায়। শরীর-রক্ষার ব্যবস্থাটুকু ব্যতীত সাধকের অন্য চেষ্টা আর কিছুই

থাকে না। শরীরের অন্যান্য ভোগ সবই নিবৃত্ত হয়। যদি কিছু থাকে, তাহা অভ্যাস ও সংস্কারের খেলা—ঈশ্বর-লীলা নহে। খাঁটি আত্মসমর্পণযোগী এ কথা ভাল করিয়াই বুঝে।

বাহিরে জাগিয়া উঠে—ত্যাগ। শরীর-পোষণ ব্যতীত কোন ভোগই ফুটিবার অবসর পায় না; কেননা, মন সতত যুক্ত হইয়া পড়ে—অন্তরের সাধনায়। সেখানে যে উৎসর্গের হোমকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত হয়, তাহাতে আহুতির বিরাম থাকে না। বলি-স্বরূপ জীবনের অসংখ্য বৃত্তি অবিরত অগ্নিশুদ্ধ হইতে থাকে।

মধ্যযুগের সাধনায় ছিল দিব্য প্রকৃতি গঠনের উপায় —ত্যাগ আর নিগ্রহ। কিন্তু নিগ্রহে বৃত্তিনিচয়ের মূল বিনষ্ট হয় না, তাই বোধহয় ভোগ-নীতি প্রবর্ত্তিত হয়। দুষ্পূরণীয় আকাঙ্খা ঘৃতাহুতি পাইয়া আরও অধিক জ্বলিয়া উঠে। জীবনের এই মহা-সমস্যা মীমাংসার জন্য শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাতে সব কিছু তুলিয়া দিতে উপদেশ দেন। গীতার এই আত্মসমর্পণ যোগ বাংলায় নানা ছন্দে আত্মপ্রকাশ করিতে চাহিয়াছে। অতীতের প্রচেষ্টা সিদ্ধমূর্ত্তি লইয়া উপস্থিত

—বাঙ্গালী অকূলে কূলের কাণ্ডারী পাইয়া উল্লসিত, নব আশায় উদ্বুদ্ধ।

ত্যাগও নয়, ভোগও নয়, নিগ্রহও নয়—মানস-ক্ষেত্রে যত ভাল মন্দ বৃত্তিই ফুটিয়া উঠুক, সাধক মনন করিয়াছে, সবই উপরে উঠাইয়া দিবে। কোন বৃত্তিই মিথ্যা নয়, মায়া নয়। সবই স্বরূপের রূপ। তবে তাহাকে জীবনের স্রোতে না নামাইয়া, উর্দ্ধে যেখানে দেবতার আসন সেইখানে পাঠাইয়া দিবে। এই উপরে উঠাইয়া দেওয়ার কৌশল—ভাবিয়া দেখিলে, বিশেষ শক্ত কথা নয়।

আত্মসাধনার উন্নতি-চিন্তা—ইহা আমি ত্যাগও করিতে পারি, ভোগও করিতে পারি, আবার নিগ্রহের দ্বারা ইহা দূর করিয়াও দিতে পারি। কিন্তু আমি ইহার কোনটিই করিব না। যথারীতি ইহার অবাধ উদয় হইবে, সঙ্গে সঙ্গে সে চিন্তা ঈশ্বরে অর্পণ করিব। কামের সঙ্কল্প—ইহাও রোধ করিব না, ত্যাগও করিব না। চিত্তে অসংখ্য বৃত্তির জাগরণের পথ রোধ করিলে, ঐশ্বর্য্যহীন হইতে হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না উপরের দিকে এই সকল বৃত্তির সহজগতি সৃষ্টি হয়, সাধক হিসাবে আমার কার্য্যই এই।

প্রবর্ত্ত দশায় এইরূপ অন্তর-সাধনার ফলে, সিদ্ধ অবস্থায় এই অসংখ্য ঊর্দ্ধযাত্রী বৃত্তি অমৃতপ্রস্রবণের মত অবতরণ করে, জীবন তখন মধুময় হয়। প্রবৃত্তির রূপান্তরেই সর্ব্বাঙ্গ রূপান্তরিত হয়। এই মহাশুদ্ধির অব্যর্থ পরিণামে বিজ্ঞানময়ী দিব্য প্রকৃতির প্রকাশ হয়।

৬

"সাক্ষাতে আছয়ে বস্তু, লোকে নাহি লয়"—এই প্রত্যক্ষ ঈশ্বর-তত্ত্বকে এই দুটা চক্ষু দিয়া দেখা চাই, এই হিয়া দিয়া ধরা চাই, এই কায়া দিয়া চরণে তাঁর লুটাইয়া পড়া চাই; তবে ভাবের উদয় হইবে, শুদ্ধ হৃদয় প্রকাশ পাইবে, নিত্য প্রেমে অভিষিক্ত হইয়া অমর হইবে; তবেই কণ্ঠে গর্জ্জিবে শিবের বিষাণ, গতির দাপটে প্রলয়ের ঝড় উঠিবে, ললাটে বিদ্যুৎ ঠিক্‌রাইয়া পড়িবে।

বাংলার যোগ, বাঙ্গালীর সাধনা—সাধককে মৌনী করে না, জড় করে না, কল্পনার কুহকে ভ্রান্ত করে না। বাঙ্গালী শক্তির উপাসনা করে, প্রেম ভক্তির অমৃত-নির্ঝর মাথা পাতিয়া ধরে। বাঙ্গালী মন্ত্রে, ভগবানের উপাসনা করে—ব্রহ্মতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব এ-কাণ দিয়া শুনে ও-কাণ দিয়া বাহির করিয়া দেয়। বাঙ্গালীর

প্রকৃতি মূলতঃ ভিন্ন ধরণের। ধর্ম্ম, সাধনা, সবই তাই অলৌকিক, আচার বিচারের বিধান মানিতে আদৌ সে চাহে না, বেদ-বিধি ছাড়া সহজ পথেই ধীরে ধীরে বাঙ্গালী দিব্য হইয়া উঠিতে চায়। অবচেতনার স্তর ছাড়াইয়া মূর্ত্ত চেতনায় বাঙ্গালীর ভাগবত সাধনা দিন দিন স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে। বাঙ্গালী সিদ্ধ জাতি, তাই সাধন তার সহজ—শ্বাস প্রশ্বাসের মত সরল; কৃচ্ছ্রতা বাহ্যানুষ্ঠানের পীড়নে বাঙ্গালীর অন্তরাত্মা অস্বস্তি অনুভব করে। কিন্তু বড় সহজ এ জাতি, তাই সহজেই পৃথিবীর বোঝা ঘাড়ে চাপাইয়া লইতে কুণ্ঠা নাই। তবে আরোপের প্রভাব চিরদিন ইহাদের আচ্ছন্ন রাখে না। বাঙ্গালী জাতির উপর কান্যকুব্জের শিক্ষা, দীক্ষা, সাধনার গুরুভার ক্রমেই লঘু হইয়া পড়িতেছে। নবদ্বীপ ভট্টপল্লীর অনুশাসনও কয়জন মানে? কয়জন ব্রাহ্মণ সন্ধ্যা-পূজায় অন্তরের শ্রদ্ধা ঢালিয়া তৃপ্তি পায়? বাঙ্গালী আহার করে, মনে করে মাকে আহুতি দেওয়া হইতেছে; নগর ফিরিয়া মাকে প্রদক্ষিণ করে; নিদ্রায় ধ্যান, শয়নে প্রণাম করিয়া জীবনকে যোগযুক্ত করিতে চায়। লক্ষ ব্রাহ্মণের কণ্ঠে

স্মৃতির বচন, আর রামপ্রসাদের কণ্ঠ যখন সুরের মূর্চ্ছনা তুলে—

"আমার কিবা দিবা, কিবা সন্ধ্যা
সন্ধ্যারে বন্ধ্যা করেছি"—

তখন বল দেখি, ভাবের পাল্লা কোন্ দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে!

বাংলার ঠাকুর নবদ্বীপচন্দ্র ন্যায়, স্মৃতি, পুরাণ গঙ্গাবক্ষে নিক্ষেপ করিয়া, আচণ্ডালে প্রেম দিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর জাতি নাই, ভাগবত সাধনায় অধিকারি-ভেদ নাই। উহা যে জীবের প্রাপ্ত বস্তু, তাই সাধ্য নহে। বাঙ্গালী চায়—কায়া আর হিয়াকে শোধন করিতে; তারই একটা সাধনা আছে, আত্মশুদ্ধির বিধি ব্যবস্থা আছে। উহা সাংখ্য পাতঞ্জলের নির্দ্দেশ নহে, সহজ জীবনের অভিব্যক্তি। বাঙ্গালীর সারা জীবনই যোগ। যোগে বাঙ্গালীর জীবন-প্রবাহ এক মুহূর্ত্তও তাই রুদ্ধ নহে।

কথা শুনিয়া অনেকেই হয়তো বিচলিত হইবেন। সাধন ভজনের এমনই উৎকট মূর্ত্তি আমাদের উপর আরোপ করা হইয়াছে, যে ইহার সহজ রূপটি সহজে

চক্ষে পড়ে না ; চক্ষে আঙ্গুল দিয়া দেখাইলেও, সহজ বলিয়া প্রত্যয় হয় না। কাজেই অসাধারণের পোষাক পরিয়া সহজই আসে, কর্ম্ম-ভোগ শেষ হইলে সহজকে পাইয়াই সাধক কৃতার্থ হয়। এই সহজের সাধনা বাংলার যে সিদ্ধ সম্পদ্, নিজস্ব সামগ্রী।

বাহিরের আরোপ হইতে মুক্তি না পাইলে নিজের বস্তুতে রুচি জন্মে না। বাঙ্গালীকে শুধু বাহিরের জীবন হইতে যে ঘরমুখো হইতে হইবে তাহা নহে ; অধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্রেও সে পরপ্রত্যাশী —অন্তর্মুখী না হইলে, আসল তত্ত্বে অধিকার জন্মিবে না। বাঙ্গালীর অধ্যাত্ম জীবন লাভের প্রথম প্রচেষ্টা আরোপের দায় হইতে মুক্তি পাওয়া, নিজেকে স্বতন্ত্র স্বাধীন করিয়া তোলা। আত্মবিধৃত সাধন-তত্ত্ব তবেই প্রকাশ পাইবে, আপনার মধ্যে অমৃত-উৎসের সন্ধান মিলিবে। বাঙ্গালী ধন্য হইবে।

আত্মসমর্পণ বাংলার প্রকৃতিতে অতি সহজেই জাঁকিয়া বসে ; আর এই আত্মসমর্পণের মূলে যে কোন দাবী থাকে, তাহাও নহে। যেখানে সহজে ইহা সিদ্ধ হয়, সেইখানেই ইহার চতুর্ব্বর্গ ফল মিলে। যুগে

যুগে এ তত্ত্বের নানা ভঙ্গী ফুটিয়াছে ; কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে ইহার চরম ও পরম ফল ফলিয়াছে। আত্মসমর্পণের যে সিদ্ধ বীজ সর্ব্বত্র আজ ছড়াইয়া পড়িতেছে, সেই কল্পবৃক্ষের মূল হইতেছে দক্ষিণেশ্বর। কিন্তু বাংলার ক্ষেত্র আজ আগাছায় পূর্ণ, সিদ্ধ বীজও তাই অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থ হইতেছে ; কিন্তু জমি প্রস্তুত যেখানে, সেখানে ফসলের দেরী নাই। তত্ত্ব-লাভের ইহা অমোঘ পন্থা। যে এ পথ ধরিয়াছে, সে মজিয়াছে। এ পথের মানুষ দেখিলে উন্মাদ হইতে হয়, না দেখিলে নৈরাশ্যে ব্যথায় বুক ভরিয়া উঠে—কেন তাহার কারণ মিলে না। ঠাকুরের কথা শুনিয়া কত লোকের মনের ময়লা কাটিত, কিন্তু নরেন্দ্র তাহা সর্ব্ব সময়ে গ্রাহ্য করিতেন না। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "আমি কি কথা শুনিতে আসি ? তোমায় ভালবাসি, তাই আসি।" এই ভালবাসার হেতু কি ? কিছুই নয়, তবুও আসা চাই—ভালবাসা চাই। এই অপূর্ব্ব সাধ্য বস্তু যে আশ্রয়ে বিকশিত হয়, সেই গুরু, সেই ভগবান—বাঙ্গালীর সাধন-ভজনের নিগূঢ় রহস্য এই তত্ত্বেই নিহিত।

এই প্রেম তো সব মানুষের মধ্যেই আছে; কিন্তু প্রেমে উন্মাদ হয় কয় জন? প্রেমের দায়ে অনেকের চক্ষেই তো অশ্রু ঝরে; কিন্তু কার অশ্রু বিশ্বের চক্ষে বসুধারা সৃষ্টি করে? কয়জন এই রূপের টানে, প্রেমের আকর্ষণে মাতাল হইয়া, দৈবের পীড়ন, আত্মপ্রকৃতির বিরুদ্ধতা, লোক-লাঞ্ছনা অনায়াসে পদতলে দলিয়া, এই অমৃতের সন্ধান দেয়? নির্য্যাতনে যার ভিতরের মৌন ক্ষুণ্ণ হয় না, বিরহে যার ভিতরের ঐক্য ম্লান হয় না, ভালবাসিয়া বিভোর, বিহ্বল, পরীক্ষার অগ্নিপরীক্ষায় উদাসীন, সে পাগল, আপনভোলা—এমন মহাপ্রেমিকের মিলনের উপরেই যে ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। এইরূপ এক পাগলের বজ্রবাণী আসমুদ্র হিমাচল কাঁপাইয়া যে প্রতিধ্বনি তুলিয়াছিল, সে নির্দ্দেশের অনুসরণ করিতেই এক যুগ কাটিয়া যায়—দলে দলে এমন পাগলের যদি সঙ্ঘ গড়ে, তাহা হইলে দেশের হাওয়া কোন্ দিকে বহিবে তাহা কি আর বলিয়া দিতে হয়!

কিন্তু তেমন ভাবে এ সাধনায় আত্মদান করিবে কে? কায়, মন, প্রাণ দিয়া কে কোথায় আত্মসমর্পণ

করিয়াছে ? অমৃতশীতল কণ্ঠে ভগবানের সে অনাহত আহ্বান কি আজ নীরব ? না—সে সুর নিত্য, কুহকিনী মায়ায় আমরা আত্মস্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যের মর্য্যাদা রক্ষায় উদ্‌ভ্রান্ত, উৎসর্গের হোমকুণ্ডে আত্মাহুতি দিয়া অমর সত্তার পরিচয় লাভে সাহসহীন। তাই ফাঁকি দিয়া, চালাকী করিয়া সাধনার পর্য্যায়গুলি অতিক্রম করিতে চাই। মনে রাখি না—সাধনার এক পর্য্যায়ের অনুভূতি পূরা হইলে সহজেই সাধক অন্য পর্য্যায়ে উন্নীত হয়; জোর করিয়া, বুদ্ধি খাটাইয়া করিতে হয় না কিছু। আমরা আটক পড়িয়াছি—বুদ্ধির প্যাঁচে। প্রাণের পীড়নে নীচের আকাঙ্ক্ষা, কামনা সূক্ষ্মরূপে আশ্রয় লয় বুদ্ধিতে। এইখানে ঠেকা খাইয়া সাধক মোহপাশে বদ্ধ হয়। এইজন্য যোগ গ্রহণ করিতে হয় বুদ্ধি দিয়া; কিন্তু সাধনের যুগে বুদ্ধির ফন্দী যতটা পারা যায়, এড়াইয়া চলিলে ভাল হয়। আত্মসমর্পণে শুদ্ধ হয় কায়া আর হিয়া। শক্তি ও শ্রদ্ধার—এই দুই কেন্দ্র-তীর্থ। আনুগত্যের সাধনা জোর করিয়া ধরিতে পারিলে, বুদ্ধির ভিতর দিয়া অহঙ্কারের চালাকী পদে পদে ধরা পড়ে; কিন্তু অহঙ্কারের

উপর ভর দিয়া যে সাধনার পথে দাঁড়াইতে চায়, গায়ের জোর আর বুদ্ধিবৃত্তিটুকুর নাড়াচাড়া করিয়াই তার জীবনের দিন কাটে। কিছুই যে না হয় তা নয়, কিন্তু আমরা চাহিতেছি কি—আমাদের ভিতর দিয়া ভগবানের চাওয়াকে সফল করিয়া তুলিতে; সে অমর প্রবাহের গতি রোধ করে যা কিছু, সে সমুদয়ের একান্ত নিরসন করিয়া চলাই সাধনা—তবে তো সাধ্য-তত্ত্ব-রূপ অমৃতের অধিকারী হইব!

ইহার সিদ্ধপথ—মন্ত্রাশ্রয়ী সত্যে একনিষ্ঠ আত্মদান। যদি আশঙ্কা থাকে, এরূপ করিলে আত্মনাশের সম্ভাবনা, তাহার পক্ষে এ যোগ প্রশস্ত নয়। আত্ম-সমর্পণের সাধনায় গোড়া হইতে যেন গোঁজামিল না থাকে। সাধক সহজভাবেই আত্মসমর্পণ করিবে এমন বস্তুতে—যে বস্তু তাহাকে আচ্ছন্ন করিতে পারে। এই আচ্ছন্নতার নেশায় সাধক বিভোর হইবে, আপনাকে হারাইয়া ফেলিবে—ইহা এক প্রকার মৃত্যু। মরণ তো জীবের নিত্য সহচর, তবে কাল-সর্পের দংশনে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরা ইহা নয়। যোগী মরে স্বেচ্ছায়—যেমন গুটিপোকা নিজের নালেই নিজে

আচ্ছন্ন হইয়া মরে। এই মরণের ভিতর দিয়াই সে আপনার রূপান্তর সাধন করে। যোগীর উদ্দেশ্যও এইরূপ নবজন্ম। যে অভ্যাস, যে সংস্কার, যে বৃত্তি, যে রূপ লইয়া জন্মিয়াছি, তাহার একান্ত পরিবর্ত্তন হওয়া চাই। আত্মসমর্পণের সাধনায় এই রূপান্তরের কথা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদগুলিতে সংক্ষেপে ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

যে রূপ, যে প্রেম এখানে, সে রূপ, সে প্রেম সেখানে অর্থাৎ হৃদয়ের উপরে উঠাইয়া দিতে হয়। নিষ্ঠা শ্রদ্ধা দৃঢ় হইলে, আপনা হইতেই ইহা ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে। ইহাকে উপরে স্থির রাখা কালসাপেক্ষ। আত্মসমর্পণের পূর্ণসিদ্ধি সেইদিন, যেদিন আধার-যন্ত্রের অন্তর্গত চেতনার কেন্দ্র উপরে উঠিতে আরম্ভ করে। ইহা অস্বাভাবিক কিছু নয়; বরং চেতনাকে নীচে আটক রাখাই স্বভাববিরুদ্ধ অবস্থা। এই চেতনার ভূমি হৃদয়, প্রাণ, মনের গণ্ডী দ্বারা আবদ্ধ বলিয়া, আমরা যাহা পাই, তাহা এই সঙ্কীর্ণক্ষেত্রেই নামাইয়া আনি; অতি বৃহৎ তত্ত্বকেও এই হেতু বিকৃত ও ক্ষুদ্র আকারে ধারণ করিতে হয়। চেতনার ভূমি যখন ঊর্দ্ধে স্থিরীকৃত হয়, তখনই আমরা পাই সত্যকে অবিকৃত ভাবে,

এবং এই অবস্থাপ্রাপ্তির জন্যই আত্মসমর্পণ যোগের নিখুঁৎ অনুষ্ঠান।

আমার সত্য স্বভাব রুদ্ধ করিয়াছে যে নীচের টান, সে টানের অন্ত হয়, যখন ষোল আনা টান এক টানে উঠাইয়া দিই। এই টানের আসল রূপ কি ?—আসক্তি। আসক্তিই আবার প্রেমের ভ্রূণমূর্ত্তি। যে আসক্তির আস্বাদ পায় নাই, সে সাধন গ্রহণের অধিকারী নয়। আসক্তির শোধন সাধনেই সাধ্য বস্তু প্রেমের উৎপত্তি—এইজন্য আসক্তির বশেই আত্মসমর্পণের আরম্ভ।

আসক্তি ছড়াইয়া আছে নানা বিষয়ে—যিনি সকল আসক্তি কুড়াইয়া কেন্দ্রস্থ করিয়া তুলেন, তিনি গুরু, তিনি দেবতা। আসক্তি এই আশ্রয়-তত্ত্বে ঘনীভূত হইলেই, তাহার রূপান্তর হয়। তখন ইহাকে বলে শ্রদ্ধা। অটুট শ্রদ্ধাই রতির আশ্রয়—ভক্তি, প্রেম, ভাব, মহাভাব, এই একই মূলবস্তুর ক্রমবিকাশ।

সাধনার পর্য্যায়গুলি গুরুমুখী করিয়া পার হইতে পারিলে, সাধ্যবস্তুর ক্রমবিকাশের সঙ্গেই আধার-

যন্ত্রে রূপান্তর ঘটে। সাধনার গোড়ায় এই মূলতত্ত্ব যথারীতি সঞ্চিত না হইলে, ঘুরপাক খাইয়া খাইয়া মরিতে হয়। সিদ্ধ পথের সন্ধান না পাওয়ায়, কৃচ্ছ্রতায় সাধক অবসন্ন হইয়া পড়ে, রসাশ্রয়ে তৃপ্ত হয় না।

মন্ত্রাশ্রয়ী সত্য—আত্মসমর্পণের যুগ। ইহার পর সাধক ভাবাশ্রয়ী হয়। যে শ্রদ্ধা, যে ভক্তি, যে প্রেম এখানে, সে শ্রদ্ধা, সে ভক্তি, সে প্রেম ভাব-রূপে উপরে স্থির হয়। আধার তখন ভাবের পরশে দ্রব হইলে, ইহার কাঠিন্য ও স্থূলতা নবনীতস্নিগ্ধ কোমল মূর্ত্তিতে পরিণত হয়। ইহাই দিব্য দেহ। মানুষ এখনও আত্মসমর্পণের কোটা পার হয় নাই, এই অপ্রাকৃত সাধনার কথা তাই আজ কল্পনার ও স্বপ্নজগতের হেঁয়ালীর মত মনে হয়। তবে এমন যুগ আসিতেছে, যখন ছেদহীন জীবনপ্রবাহে ভাসিতে ভাসিতেই বাংলায় এইরূপ সিদ্ধজাতি গড়িয়া উঠিবে; এবং সে জাতির অভ্যুত্থান নিজেদের মধ্যেই সম্ভব করিয়া তুলিতে জীবন ঢালিয়াছি। আমাদের বিশ্বাস—এই সাধনার পথেই, জাতির মুক্তি ও সিদ্ধি একান্তভাবে নির্ভর করিতেছে।

৭

এ পর্য্যন্ত সাধনার গৌরচন্দ্রিকাই করা হইয়াছে, আসল কথা বলা হয় নাই। বলিবার সাধ্যও নাই, ভিতরের ভাব ভাষায় অর্দ্ধেকেরও কম বাহির হয়। লেখনী-মুখে ইহার অনুবাদ পঙ্গু ও অসম্পূর্ণ হইয়া পড়ে। তবে মর্ম্মী যাঁরা, যাঁরা সাধনার কিছুমাত্র আস্বাদ পাইয়াছেন, তাঁরা এই অস্পষ্ট অভিব্যক্তি হইতে কিঞ্চিৎ সঙ্কেত পাইতে পারেন। সাধনার নিগূঢ় রহস্য গুরুমুখী হইয়াই জানিতে হয়। মুখের কথায়, পুস্তকের লেখায় সামান্য ইঙ্গিত দেওয়া যায় মাত্র, এ কথা বলাই বাহুল্য।

মানুষের সর্ব্বস্ব—মন। মনের অর্দ্ধেকখানি জগৎ নীচের দিকে ঝুঁকিয়া আছে, অপরার্দ্ধ কোথাও কোথাও মুক্তি পাইয়াছে নীচের আবরণ হইতে। এই আধখানা মনের ক্ষেত্রেই সাধারণতঃ সাধনার সঙ্কেত বিদ্যুতের মত ঝিলিক দিয়া উঠে। কিন্তু মনের অধিকাংশ ভাগই নীচের টানে অবনত থাকায়—যে আলোটুকু উপরে দেখা দেয়, তাহা নীচে আসিয়া

মিলাইয়া যায়, ক্ষেতের আলে গর্ত্ত রাখিয়া জল ঢালার মতই আমাদের অবস্থা। উপরের দিক্‌টা যেমন অসীম অনন্ত, নীচের গভীরতারও তেমনি অন্ত নাই; কাজেই যত শান্তি, যত আলো মনের উপরে সঞ্চিত হয়, সবই নীচের টানে তলাইয়া যায়। পরিধিহীন জীবনের অতলে, কত যুগ যুগান্তরের তপঃশক্তি যে থৈ না পাইয়া চিরতরে ডুবিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

সাধনার গোড়ার কথা, তাই নীচের দিক্‌টাকে সর্ব্বাগ্রে সামলাইয়া চলা। অধঃ ও ঊর্দ্ধ চেতনার মাঝে—মনের জগৎ। বুদ্ধি—মনের পরিণত রূপের কিয়দংশ। এই অংশ নির্ম্মল সূর্য্যকিরণের স্পর্শে উজ্জ্বল, তাই ইহারই আকর্ষণে মনের উপরাংশ ইন্দ্রিয়-গুলিকে টানিয়া বুদ্ধির অনুগত করিতে চেষ্টা করে। এই প্রমাথী ইন্দ্রিয়গণের সহজ স্বভাব বলপূর্ব্বক বিবেকী পুরুষের মনকেও হরণ করে; তাই ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া আত্মপরায়ণ হওয়ার প্রচেষ্টা সাধনার প্রধান অঙ্গ। ইহাতে অকৃতকার্য্য হইলে, মনের সঙ্গে বুদ্ধিও গ্রাসিত হয়। তখন অন্ধতম আবর্ত্তে নিমজ্জিত হওয়া ছাড়া আর উপায় থাকে না।

এইজন্য বুদ্ধিকে যুক্ত করিতে হয় এমন কিছুর সঙ্গে —যাহা চির ভাস্বর, স্থির, অচলপ্রতিষ্ঠ। টানাটানিতে বুদ্ধি লক্ষ্যচ্যুত না হয়, ইহার ব্যবস্থা করিয়াই সাধন-সমরে প্রবৃত্ত হইতে হয়। এই আয়োজনের সূচনা—আত্মসমর্পণ যোগ। সমুদয় কাম্যবস্তু উপেক্ষা করিয়া, নিস্পৃহ, নিরহঙ্কার ও বিষয়ে মমতাশূন্য হওয়া এই যোগাঙ্গের লক্ষ্য। ইহার কথা পূর্ব্বে বহুবার বলা হইয়াছে।

সাধনার দ্বিতীয় স্তরই—প্রকৃতি-সাধনার যুগ। আত্মসমর্পণ যোগের পর প্রকৃতি-যোগ, ইহার পর সিদ্ধযোগ। সিদ্ধযোগে সাধনার প্রয়োজন থাকে না। সর্ব্বগত ব্রহ্মের মত, সিদ্ধযোগী "নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্"—সর্ব্বদা, সর্ব্বত্র, সর্ব্বকার্য্যেই জগৎপ্রাণ সমীরণের মত সিদ্ধ পুরুষেরা অবস্থান করেন। তাঁহাদের চেষ্টা করিয়া, সাধনা করিয়া কিছু করিতে হয় না। আপ্তকামী সিদ্ধ পুরুষের সবখানিই যে ব্রহ্মময়!

আত্মসমর্পণের মত, প্রকৃতি-সাধনারও একটী বিশিষ্ট ভঙ্গী আছে। আত্মসমর্পণ করিতে হয়—গুরুর কাছে; আনুগত্যের সাধনা ইহার বিশেষ ভঙ্গী। অনুগত

বিনা সাধন-তত্ত্ব অধিগত হয় না। জীব যখন সামান্য, মনের আঁধারে দিশাহারা, উপরের এক কণা আলোও জীবনে যখন স্পর্শ দেয় না, তখন গুরুই কৃপা করিয়া আশ্রয় দেন অকূলে, আঁধারে—তারপর এই আশ্রয়-তত্ত্বে আপনাকে উঠাইয়া, বাহ্যে ভাগবত বস্তু আরোপ করিতে হয়। এই সাধনার পরিণত অবস্থা—আপনার বিশুদ্ধ প্রকৃতিকে আবিস্কার করা ও প্রকৃতিসিদ্ধ হওয়া। প্রকৃতি হইয়াই পুরুষকে পাইতে হয়। অস্বতন্ত্র-রূপে পুরুষের সহিত আত্মচেতনার সম্মিলন—যোগের চরম সিদ্ধি।

সংক্ষেপে সাধনার আমূল পদ্ধতি আর একবার উল্লেখ করিলে, কথাগুলি আরও স্পষ্ট হইতে পারে।

আত্মসমর্পণ যোগের আরম্ভ—মন্ত্রাশ্রয়ে। মন্ত্র—বাহ্য উপকরণ। শ্রবণে নয়নে যে তরঙ্গের স্পর্শ মনে গিয়া আঘাত দেয়, যে আঘাতের আবর্ত্তে অধোমুখী মনোবৃত্তি উপরে ঢেউ দিয়া উথলিয়া উঠে, সে মন্ত্রের সাধন আছে। মন্ত্রের সঙ্গে ভাবের উদয় হয়। মন্ত্র ও ভাবের সাধনা ঠিক ঠিক হইলে, অবধারিত সিদ্ধি লাভ ঘটে। মন্ত্রে হয়—ইষ্টলাভ ; ভাবে—স্বরূপোপলব্ধি হয়। ইষ্ট—ভগবান,

স্বরূপ—ভাগবত প্রেম। প্রবর্ত্ত সাধনায় গুরুতেই ভগবানের আরোপ সাধিয়া নিষ্ঠার উদয় হয়। চিত্ত নিষ্কলুষ হইলে, নিত্য ভাগবত প্রেম স্বতঃই প্রকাশ হইয়া পড়ে। অতএব সাধনা চিত্তের, অন্তঃকরণের শুদ্ধিতেই। নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বর-তত্ত্ব গোপন থাকে না। যাহা আছে, তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করাই তো সাধনা।

চিত্ত আশ্রয় করিয়াছে—শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে। এই বহিরঙ্গের সাধনা বাহ্যবস্তু ধরিয়া সাধিত হয়। আত্মসমর্পণের সাধনা এই কারণেই সাধন-পথের অপরিহার্য্য ব্যবস্থা।

বলিয়াছি—অধ্যাত্মযোগের শোধন-নীতি অন্যান্য সাধনা হইতে একেবারেই স্বতন্ত্র প্রকারের। এই যোগে বাহ্যানুষ্ঠানের আদৌ প্রয়োজন হয় না; অন্তর্যোগেই সব সিদ্ধ হয়। আসন, প্রাণায়াম, জপ, হোম প্রভৃতি প্রচলিত শুদ্ধির বিধান আত্মসমর্পণ যোগীর মুখ্য সাধনা নয়। কোনরূপ কৃচ্ছ্রতার পীড়নে সাধককে উৎপীড়িত হইতে হয়না। ভাগ্যবশে সাধকের অন্তরে কোন মানুষে, ভাবে বা বস্তুতে যদি অকৃত্রিম শ্রদ্ধার উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে এই সূত্র ধরিয়া সাধক অন্তর ও বাহ্যকে

অহঙ্কার ও বাসনার বাঁধন হইতে মুক্ত করিতে পারে। শ্রদ্ধাই আত্মসমর্পণ যোগের প্রধান উপকরণ। যে বস্তুতে শ্রদ্ধার উৎপত্তি হয়, সে বস্তুর উপর একনিষ্ঠ সেবা ও অনুরাগের প্রলেপ দিতে দিতেই বাহিরের দিক্‌টা ফরসা হইয়া যায় ; আর অন্তরে বিছাইয়া দিতে হয় সিদ্ধমূর্ত্তি শ্রদ্ধাস্পদের আসন, সেইখানে তন্ময় হইয়া আপনার সকল চাওয়া উৎসর্গ করিয়া যাইতে হয়। এই ভাবের উৎস যদি অনাহত প্রবাহে ছুটিয়া চলে, তবে জীবনের সঞ্চিত মলামাটী বিধৌত হইয়া আবরণকে সরাইয়া দেয়। তখন আত্মস্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়ে।

শ্রদ্ধার উৎপত্তি যেখানে সহজ, সেইখানেই স্বরূপের প্রত্যক্ষ সাধনা। বৃক্ষের সবুজ শাখাকে উদ্ভিন্ন করিয়া ফুল যেমন স্বভাবতঃই বিকশিত হয়, হৃদয়ের শ্রদ্ধাও তদ্রূপ স্বতঃই প্রকাশিত হয়। ইহারই নাম মুখ্যা রাগাত্মিকা ভক্তি। সাধিয়া শ্রদ্ধার সৃষ্টি গৌণ ভক্তির লক্ষণ। রাগানুগা ভক্তির ক্ষেত্রই ভাগবত প্রকাশের সিদ্ধ ক্ষেত্র। এই রাগানুগা ভক্তি শাস্ত্রের যুক্তি মানে না, পবিত্র গঙ্গোত্রীধারার মত বন্ধুর গিরিশৃঙ্গ হইতে গিরিশৃঙ্গে আছড়াইয়া পড়ে, কত অসংখ্য খানা ডোবা

ভরাইয়া, দুর্গম অরণ্যানী ভেদ করিয়া, বাধা বিঘ্নকে প্রবল তরঙ্গে ভাসাইয়া, শ্রদ্ধা ভক্তের হৃদয়ে ভগবানের জয়ধ্বজা উড়াইয়া দেয়। ইহার অভাব যেখানে, সেইখানেই বৈধী ভক্তির সাধনা। শিক্ষা দিয়া, শ্রদ্ধা সেখানে জাগাইতে হয়। নারীকে পতির হস্তে অর্পণ করিয়া বলিয়া দিতে হয়—ইহাকে প্রণাম করিও, পতির অনুগত হইলে ইষ্টলাভ হইবে। শিষ্যকে গুরুগীতা পড়াইয়া শ্রদ্ধার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিতে হয়। এই বৈধী ভক্তির অনুশাসন সর্ব্বক্ষেত্রে সাধককে সার্থক করে না ; তবে সহজে যাহা জন্মে না, কসরৎ করিয়া সে সাধ্য-তত্ত্বের অনুশীলন একেবারেই নিরর্থক নহে।

শ্রদ্ধা যে আধারে বিনা আয়াসে, বিনা চেষ্টায় আপনা হইতে উদ্ভূত হয়, শ্রদ্ধার বান ডাকিয়া যে জীবন ভাসাইয়া দেয়, সে জীবনে প্রাকৃত ক্ষোভের মূল পর্য্যন্ত যে উপড়াইয়া যায়, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। অথচ বাহিরের দিক্ হইতে প্রাকৃত ভোগের কুসংস্কার ও অভ্যাস হইতে মুক্তি পাইবার জন্য কি প্রাণপণ আয়াস না করা হয়! কিন্তু ইহাতে বিষয়ানুভব নিবৃত্তি

পাইতে পারে, পরন্তু ভোগাভিলাষ দূর হয় না। চাই আত্মস্বরূপ ইষ্টকে সম্মুখে রাখিয়া তন্ময় হইয়া যাওয়া। নিষ্ঠা ও প্রগাঢ় আসক্তির বলেই সাধক আত্মসমর্পণ যোগের ভিতর দিয়াই ইন্দ্রিয়জয়ী হয়, তার বিকারহীন প্রেম স্বরূপ-রূপেই তাহাকে ছাইয়া ফেলে, রক্ত-মাংস, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, ভাগবত রসে প্লাবিত হইয়া অমৃতময় হয়। এইরূপ সিদ্ধ আধারই প্রকৃতি-সাধনার উপযোগী হইয়া উঠে, নতুবা তটস্থ সাধকের মত উঠা নামার দ্বন্দ্ব-যুদ্ধেই জীবনের আয়ুঃ শেষ হয়।

শ্রদ্ধা একেবারেই খাঁটি হয় না, কামনার মিশ্রণ থাকে। তবে একনিষ্ঠ শ্রদ্ধা ধীরে ধীরে নিষ্কলুষ হয়। বিশুদ্ধ শ্রদ্ধা আশ্রয়-তত্ত্বের উপর অপার্থিব নিষ্কাম আকর্ষণ সৃষ্টি করে। জীবনের সকল টান তখন একমুখী হয়। সাধক বিষ চাহিলেও, ভগবান তাহাকে অমৃতের অধিকারী বলিয়াই তাহার জীবন অমৃতময় করিয়া দেন। বৈষ্ণব কবি বলেন—

"কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে, পায় কৃষ্ণ রাস।
কাম ছাড়ি দাস হইতে হয় অভিলাষ॥"

মানুষ যখন ভগবানকে চায়, তখন একেবারেই

নিষ্কাম হইয়া ভগবানে রতি স্থাপন করিতে পারে না ; কিন্তু লক্ষ্য যদি ভাগবত হয়, তবে আশ্রয়-তত্ত্বের ভিতর দিয়া ভগবানের করুণা অজস্রধারে ভক্তকে অভিষিক্ত করিয়া, তাহার সবখানি দিব্য করিয়া দেয়।

অন্তর ও বাহ্য এইরূপ শোধনে যখন দিব্য হয়, তখন ভাবের উৎপত্তি হয়। এই ভাবই আত্মপ্রকৃতির দিব্যরূপ। এই দিব্য শক্তি তখন আধার-যন্ত্রকে ঘিরিয়া রসের সৃষ্টি করে। প্রকৃতি রসময়ী। এই রসেরই পরশে কায়া ও হিয়া নিত্য হইয়া উঠে। এই নিত্য দেহই ভগবানের পবিত্র রাসমন্দির।

জীবের রক্তে মাংসে, মনে প্রাণে যে দিব্য চেতনা বাঁধা পড়িয়া খণ্ডিত ও অনিত্যরূপে গুমরিয়া মরিতেছে, শ্রদ্ধার পরশেই তার জড়ত্বের বাঁধন আল্‌গা হইয়া যায়, চেতনা যন্ত্র-মুক্ত হইয়া বিস্তৃত ক্ষেত্রে ছড়াইয়া পড়ে। ফুল ফুটিলে ইহার সৌরভ যেমন আকাশে ছড়াইয়া পড়ে, ফুলের বুকে জড়াইয়া থাকে না ; সেইরূপ আত্মচেতনা আধার হইতে মুক্তি পাইয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়া স্থিরপ্রতিষ্ঠ হয়। এই মুক্ত চেতনার

ক্ষেত্রেই অনন্ত ভগবানের আদেশ অবিকৃত বিশুদ্ধ আকারে ফলিয়া উঠে; আর সেই চাওয়া নীচের জগতে সার্থক হইবার জন্য বিদ্যুৎশক্তি সঞ্চারে জীবাধার তোলপাড় করিয়া দেয়। শুদ্ধ আধারেই সিদ্ধমূর্ত্তি প্রকাশ পায়। আধারে কণামাত্র কলুষ থাকিতে, চেতনার মুক্ত ক্ষেত্র গড়িয়া উঠে না। যে ভগবান আজ মনের জগতে, সেই ভগবানের অনন্ত রূপটী, নিজের নিত্য শাশ্বত প্রকৃতির ক্ষেত্রে অবধারণ করাই প্রকৃতি-সাধনার লক্ষ্য। ইহা সাধক-ভাবের কথা। আত্মসমর্পণের সম্পূরণে এই সাধক-ভাবের স্বতঃস্ফুরণ হয়। তাই ইহার একটু পরিচয় দেওয়া এক্ষেত্রে প্রয়োজন মনে করি।

৮

আত্মসমর্পণের সাধনায়, শরীর, প্রাণ, মন, বুদ্ধি ইষ্টের আনুগত্যে সতত নিযুক্ত রাখিতে হয়। আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা পূরণের ফাঁক না থাকায়, এইগুলি কামনা-বর্জ্জিত হইয়া নিষ্কলুষ হইয়া উঠে। আধার-যন্ত্রের এইরূপ সম্যক্ পরিশুদ্ধির অনিবার্য্য পরিণতি—প্রকৃতি-সাধনার সূত্রপাত। সাধনা বলিতে যাহা কিছু এই কালেই আরম্ভ হয়। আত্মসমর্পণের সাধনা প্রবর্ত্ত সাধনার যুগ। সাধক বলেন ঃ—

"প্রবর্ত্ত ভাবের প্রাপ্তি শ্রীগুরুচরণ"

এই শ্রীগুরুর চরণ সবখানি দিয়া বরণ করিতে না পারিলে, শোধন সম্পূর্ণ হয় না। বাহ্যে ভগবদ্-বস্তু আরোপ করিয়াই তো সামান্য হইতে বিশেষ জ্ঞান জন্মে। এইখানেই তো সাধ্যবস্তুর পরম পরীক্ষা।

"জীবে যারে নাহি লয় সামান্য জ্ঞান করি
তারে গুরু করি মুঞি আশ্রয় তাহারি।"

যখন আমার আশ্রয়-তত্ত্বকে সামান্য জ্ঞানে মানুষ উপেক্ষা করে, তাঁহাকে দেবতার আসনে উঠাইয়া কতখানি বুকের শ্রদ্ধা ঢালিয়া যে আমায় পূজা করিতে হয়, কত বাধা ঠেলিয়া যে আমার সহস্রমুখী প্রবৃত্তিকে একনিষ্ঠ রাখিতে হয়, তাহা মর্ম্মী ভিন্ন অন্যে আর কে বুঝিবে!

আত্মসমর্পণের এই কঠোর যুগ অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারিলে, সাধক-ভাবের প্রাপ্তি। বিশুদ্ধ আত্ম-প্রকৃতিতে ইষ্টের বিগ্রহ নির্ম্মাণের ক্রিয়া আরম্ভ হয়। বাহ্যে দেবতার প্রতিষ্ঠা সিদ্ধ হইলে, তবে এই দশা প্রাপ্ত হওয়া যায়। দক্ষিণেশ্বরে এই সাধনার নিখুঁৎ চিত্র ফুটিয়াছিল। বাঙ্গালীকে সাধন-তত্ত্বের নিগূঢ় মর্ম্ম-কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, দক্ষিণেশ্বরে যে জীবনবেদ রচিত হইয়াছে, তাহার অনুধাবন করিতে হইবে।

কত উপেক্ষা, পরিহাস, লাঞ্ছনা, কত বাধা বিঘ্নের মাথায় পা দিয়া, ঠাকুর যেদিন জড় প্রস্তরমূর্ত্তির আশ্রয়ে আরাধ্য দেবতার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিলেন, সেইদিন তিনি বাহ্য ত্যাগ করিয়া, অর্দ্ধ-বাহ্য দশায়

আত্মসাধনায় প্রবৃত্ত হইবার অধিকার পাইলেন। এই অর্দ্ধ-বাহ্য-দশা সাধক অবস্থা—প্রকৃতি-সাধনার সূচনা।

অর্দ্ধবাহ্য-দশার পরেই অন্তর্দ্দশা, এই অবস্থায় বাহ্যান্তরভেদ থাকে না। কিন্তু অর্দ্ধ-বাহ্য দশায় বাহ্যের সহিত ক্ষণে ক্ষণে বিচ্ছেদ দেখা যায়। যে ইষ্টকে লক্ষ্য করিয়া সাধনার আরম্ভ, উহা যখন কখনও বাহিরে, কখনও অন্তরে লুকোচুরি খেলিতে থাকে, তখন বড় গোলযোগ হয়। এই অবস্থায়, ঠাকুর পূজাঘরে গিয়া, ফুল লইয়া নিজের মাথায় ছড়াইয়া দিতেন, আবার প্রসাদী ফুল মায়ের মাথায় অর্ঘ্য-স্বরূপ অর্পণ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। লোকে তাঁহাকে এই সময়ে পাগল ভিন্ন অন্য কিছু মনে করে নাই। কিন্তু তিনি তখন দিব্য জ্ঞানের মাঝ-পথে আপনহারা; একবার বাহিরে, একবার ভিতরে উঁকি ঝুঁকি মারিতেছেন। এই ভাব-সাধনার যুগে, অন্তর বাহির লইয়া অল্প বিস্তর গণ্ডগোল সর্ব্বক্ষেত্রেই দেখা যায়। আসল কথা—যে রূপ এখানে, সে রূপ সেখানে উঠাইয়া, আপনাতে আপনি ভরিয়া থাকার ইহা উদ্যোগ-পর্ব্ব।

অন্তর ও বাহির, এই দুয়ের মাঝে, প্রাণ সেতু-স্বরূপ আধারটীকে যেরূপ অখণ্ড রাখিয়াছে, এই প্রাণের অন্তর্দ্ধানে যেমন অন্তরচেতনার কোন সাড়া থাকে না, একান্ত জড়ের মত শরীর দ্রুত বিনষ্ট হয়; তদ্রূপ সমগ্র আধার-যন্ত্রটীকে অনন্ত জ্ঞান, প্রেম ও শক্তিস্বরূপ শ্রীভগবানের সহিত যুক্ত রাখিয়াছে যে চেতনার প্রবাহ, আধারের অন্তর্গত রুদ্ধ চেতনাকে উহার সহিত যুক্ত করিতে না পারিলে, সামান্য জীবের মত জগতে বিচরণ করিতে হয়, সাধনা বাহ্যকে অতিক্রম করিয়া কোন কালে অন্তরের অমর সত্যের সহিত অভিন্ন পরিচয় স্থাপনে সমর্থ হয় না।

সাধারণতঃ প্রবর্ত্ত-যোগীদের যখন ধ্যান করিতে বলা হয়, তখন হয় তাহাকে নাভিমূলে, না হয় হৃদয়ে অথবা ভ্রূ-মধ্যে মনঃ-সংযোগ করিতে উপদেশ দেওয়া হয়। ইহার অর্থ আর কিছু নয়, আত্মচেতনার কেন্দ্র নিরূপণ না হইলে, সাধনার আরম্ভ হয় না। স্বভাবতঃ জীবের চেতনা-কেন্দ্র আধারযন্ত্রের কোন একটী কেন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া সুপ্ত থাকে; শরীরের ব্যথা-স্থানে সহজেই মন পড়ে। সাধনার অবস্থাতেও

এই একই কথা। যেখানে চেতনা, চিত্ত সহজে সেইখানে পতিত হয়। একান্ত অশুদ্ধ জীব হাতড়াইয়া মরে, তাহারা যোগের অধিকারী নয়।

চেতনা যে কেন্দ্রে রুদ্ধ, শুদ্ধি সেখানে অনায়াসেই সাধিত হয়। কেন্দ্রস্থিত অশুদ্ধি, শোধনের জন্যই চেতনাকে টানিয়া রাখে। অজ্ঞানী জীব চেতনার চাপে অতিষ্ঠ হইয়া, ক্ষয়ে অপচয়ে ইহা হইতে মুক্তির প্রচেষ্টা করে; যোগী অশুদ্ধ বিষয় চেতনার স্পর্শে রূপান্তরিত করিয়া, দেবকার্য্যে ব্যবহার করিবার উপযোগী করিয়া লয়। যোগীর শোধন-নীতি তাই অন্যান্য সাধনার অনুরূপ আদৌ নহে।

আত্মসমর্পণ যোগে, চেতনার খেলা আধার-যন্ত্রের শুদ্ধির জন্যই নিয়মিত হয়। প্রয়োজনমত যন্ত্র-কেন্দ্রগুলি নিরাময় হইলে, চেতনা আধার হইতে মুক্তি পায়। আমাদের উর্দ্ধে জ্ঞান, শক্তি, প্রেমের যে অনন্ত প্রবাহ—উহা হইতে যে অজস্র বর্ষণ হইতেছে, উহারই দুই এক বিন্দুর স্পর্শে আমরা উদ্বুদ্ধ হই; যোগী আত্মচেতনা দিয়া উহার একটী ধারা আধারে নামাইয়া আনিবার জন্য উদ্যত হয়। প্রথমে

চেতনার ক্ষেত্রেই ইহা বিধৃত হয়; তারপর চেতনা উপচিত হইয়া এই অজস্র মন্দাকিনী ঝরিতে থাকে আধারে। আধার ধারণসামর্থ্যে উপযোগী না হইলে, ইহার ভারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। এইজন্য গোড়া বাঁধিয়া সাধন-পথে আগাইতে হয়।

উপর হইতে যে শান্তি ও আলোর ঝরণা অবতরণ করে, উহার স্পর্শেই আধার দিব্য-সৃষ্টির সিদ্ধ-যন্ত্র হইয়া উঠে। এই সৃষ্টি নূতন কিছু নহে—আমি স্বরূপতঃ যাহা, তাহাই হইয়া উঠা। রুগ্ন কামকলুষ-জর্জ্জরিত আধার-যন্ত্র অমৃতপরশে তরুণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। এই উপরের অমৃত-প্রবাহকে আধারে নামাইবার সঙ্কেত সহজিয়া সাধনাতেও আছে। সেই পৌষ মাঘ মাসের শিশির কুম্ভ ভরিয়া পাপদগ্ধ মস্তকে পদে সর্ব্বাঙ্গে ঢালিয়া শীতল হইতে হয়। প্রবর্ত্ত দশায় যে অমৃত করুণা-রূপে বর্ষিত হয়, সাধক অবস্থায় সেই অমৃত-পরশ নবজীবন দান করে—সিদ্ধ যোগী এই অমৃতের অভিষেকেই দিব্য দেহ প্রাপ্ত হয়। বিজ্ঞানলোকে আমার যে কল্পমূর্ত্তি, বস্তুতঃ তাহাকে জীবনে ফলাইয়া তোলাই সিদ্ধ যোগের লক্ষণ।

সাধনায় পর পর তিনটী ক্রম অতিক্রম করিয়াই ইহা সিদ্ধ হয়।

আত্মসমর্পণ যোগে আমরা আধারকে কিয়ৎ-পরিমাণে অধ্যাত্মশক্তিপূর্ণ করিয়া তুলিতে পারি। ইহাতে আধারস্থিত মানুষী স্বভাব ও সংস্কার নির্ম্মূল হয় না। সাধনার প্রভাবে সব কিছু সুপ্ত হইয়া থাকে। অধ্যাত্মযোগী ইহা অনায়াসেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

আত্মসমর্পণের সাধনার অতি উন্নত অবস্থায়, যখন বুদ্ধি উচ্চভাবযুক্ত হইয়া অবস্থান করে, তখনও স্নায়ু ও মাংসপেশীর স্বভাব হইতে আমরা সম্পূর্ণরূপে মুক্তি পাই না। বুদ্ধির সবখানি অধ্যাত্মময় হইলেও, অন্য এক বুদ্ধির লক্ষণ অনুভূত হয়—উহা নীচের টানে জীবনের কতকটা অংশ ঝুলাইয়া দিবার যুক্তি প্রদর্শন করে। অনেক ক্ষেত্রে অধ্যাত্ম জীবনের প্রতিষ্ঠা পাইয়াও, সাময়িক ভাবে বহু সাধককে পশুবৎ আচরণ করিতে দেখা যায়। অধ্যাত্ম জীবন লাভ করা যত না শক্ত, ইহা রক্ষা করা আরও অধিক শক্ত। এই আধার লইয়া ধর্ম্মজীবন অটুট রাখিতে

হইলে, নিয়ত নীচের টানের সহিত সংগ্রাম করিতে হয়। সংগ্রামে জয় পরাজয় অনিশ্চিত, সামান্য অসাবধানতায় পতনের সম্ভাবনা থাকে। তাই জীবনের পুরাতন ভিত্তি উপড়াইয়া একটা নূতন জন্ম লইতে না পারিলে, খাঁটি দিব্য জীবনের আশা দুরাশা মাত্র।

এই জীবন থাকিবে, অথচ দিব্য জীবনের অধিকারী হইব, এরূপ হয় না। সাধনা ঠিক মত লইলে, প্রথমে সাধককে গোত্রান্তরিত হইতে হইবে, তারপর জন্মান্তর ও দেহান্তরের কথা। এ দেহের রূপান্তর যদি না হয়— মন যত উচ্চ ভূমিতে উঠাইয়া ধর, স্নায়ু ও শোণিতের আকর্ষণে তোমায় যে কোন মুহূর্ত্তে নীচে আছাড় দিয়া ফেলিতে পারে।

অসংখ্য কোষের সমবায়ে আধারের সৃষ্টি। প্রতি কোষের স্ব স্ব স্বভাবানুযায়ী বৃত্তি ও উহা উপভোগের ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র-কেন্দ্র আছে। এক বিন্দু রক্তেরও প্রাণ আছে, মন আছে, বুদ্ধি আছে। তোমার প্রবল বুদ্ধি এই সকল অসংখ্য আণবিক দেহের প্রতিনিধি-স্বরূপ। উপরের আকর্ষণে এই মোড়ল বুদ্ধি মুগ্ধ হইয়া ছুটিলে, নীচে যে বিদ্রোহসৃষ্টি হইবে, তাহা প্রশমিত করা

সাধ্যে কুলাইবে না। এইজন্য সাধনা এমন পূর্ণাঙ্গ হওয়া উচিত, যাহাতে প্রতি রক্তবিন্দুটীর স্বভাব ও সংস্কার দিব্য হইয়া উঠে। আধার-যন্ত্রের একটি স্নায়ুও যদি মূল সত্যের আনুগত্যে অস্বীকৃতি প্রকাশ করে, জানিও পূর্ণ সিদ্ধি দুঃসাধ্য হইবে। অঙ্গের একটী ক্ষুদ্র অংশ বাদ দিয়া পূর্ণ যোগ সম্ভব হয় না।

চাই আত্মপ্রকৃতির আমূল পরিবর্ত্তন, সঙ্গে সঙ্গে আধার ও আধারস্থিত যন্ত্রনিচয়ের রূপান্তর সাধন। আত্মসমর্পণে নীচের অসংখ্য প্রকার আকর্ষণ হইতে আত্মরক্ষার দৃঢ় সংযম লাভ হয়; পরন্তু জীবনের খাঁজে খাঁজে যে সব মারাত্মক পশুভাব লুকাইয়া থাকে, তাহাদের একান্ত নিরসন হয় না। এইজন্য চাই—দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধিকে ছাড়াইয়া, ভাবের জগতে আত্ম-স্বরূপের সন্ধান। চেতনাকে উর্দ্ধে তুলিয়া এই কার্য্যে যুক্ত হইতে হয়। নিবিড় সাধনায় ব্যাপৃত হইলে, স্বভাবতঃ নীচের উত্তাল প্রবৃত্তিতরঙ্গ নিস্তব্ধ হইয়া পড়ে। বিজ্ঞানময় কোষে যে দিব্য দেহ, প্রাণ, মনের আভাস ফুটে, সিদ্ধ যোগ তাহাকেই এই জগতে

বিগ্রহান্বিত করিয়া তুলে। মূলে যে নিখুঁৎ সত্য রূপটী আছে, প্রকাশের ক্ষেত্রে উহা প্লাবনের আবিলতাময় প্রথম প্রবাহের মত অনির্ম্মল ও বিকৃত আকারে দেখা দেয়। উহাকে স্বচ্ছ ও অবিকৃত করার উপায়—নীচের মন্থন নয়, উপর হইতে উৎসরিত দিব্য জীবনপ্রবাহকে অনর্গল ধারে নামাইয়া আনা।

যে চেতনা নীচের জগতে কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছে—তাহাকে উর্দ্ধে উঠাইবার প্রয়াস কালে, জীবন বিপন্ন হইতে পারে। কি অধঃ, কি উর্দ্ধ, উভয় দিকই অন্তহীন। এই দুই সম্পূর্ণ বিপরীত পথের যাত্রী জীবনের প্রতি সমান উদাসীন। শরীর জ্ঞান উভয়েরই লুপ্ত হয়, ইহারা জীবন বিকাইয়া পাথেয় সঞ্চয় করে। অধ্যাত্ম যোগীর লক্ষ্য—জীবনকে ভাগবত করা। তাই জীবনের কেন্দ্র-তীর্থ হৃদয়ে চেতনার দৃঢ় বাঁধন রাখিয়া, উহা উর্দ্ধে সম্প্রসারিত করিয়া দিতে হয়।

তখন এই দিব্য চেতনার মধ্যে সুপ্ত আত্ম-স্বরূপের পূর্ণ চিত্রটী ফলিয়া উঠিতে থাকে। মনের জগতে

প্রতিভাত হয়—যেন চেতনার তুলি দিয়া সাধক আপনাকে এইখানে বসিয়া আঁকিয়া লইতেছে। চিত্র যতক্ষণ না পূর্ণাঙ্গ হয়, ততক্ষণ সাধকের বিরাম নাই। তারপর যখন উহা সম্পূর্ণ হয়, অতি ক্ষিপ্রতার সহিত অভিনব কর্ম্মে উহা জীবনের সবখানি ভরিয়া ব্যাপৃত হইয়া পড়ে।

প্রকৃতি-সাধনায় উদ্বুদ্ধ জীবন অবকাশহীন হইয়া পড়ায়, নীচের কর্ম্মজীবনে আর তেমন উৎসাহ দেখা যায় না। প্রবৃত্তির ঘোরে যে সকল কর্ম্ম প্রসূত হইত, সেগুলির মূলোচ্ছেদ হইয়া যায়। জীবন কর্ম্মহীন বলিয়া প্রতীত হয়, অথচ জীবনের মূলে প্রবল ক্রিয়া চলিতে থাকে বলিয়া নৈষ্কর্ম্ম্যজনক ঔদাসীন্যে কোন অঙ্গই পঙ্গু হইতে পারে না; বরং অচঞ্চল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শান্তি ও আনন্দের অভিষেকে নূতন ও স্বাস্থ্যপূর্ণ হইয়া উঠে। উপর হইতে মন্দাকিনীপ্রবাহকে মাথা পাতিয়া ধরিবার জন্য ধূর্জ্জটী যেমন আত্মসামর্থ্যে নিসংশয় হইয়া দৃঢ়পদে দাঁড়াইয়াছিলেন, তেমনি সাধক উপরের সৃষ্টিকে আত্মপ্রতিষ্ঠানে অবিকল নামাইয়া আনিবার জন্য সতত প্রস্তুত থাকেন।

এই প্রতীক্ষা এত পুলকময় ও আনন্দজনক, তাহা তুলনাহীন।

আত্মসমর্পণের সাধনায় আধার-যন্ত্রের এক প্রস্থ শুদ্ধি সম্পন্ন হয়, প্রকৃতি-সাধনায় উহা সম্পূর্ণ হয়। তখন আধার সিদ্ধ-যোগের উপযোগী লীলাক্ষেত্রে পরিণত হয়।

৯

রস আর ভোগ, এই দুই লইয়া জীবন। যে যোগ জীবনের জন্য, সে যোগের এই নিগূঢ় রহস্য অনেকের জানা নাই। রস—প্রকৃতি, ভোগ—ঈশ্বর-তত্ত্ব। কৃষ্ণকালীর মিলন—জীবনের ধর্ম্ম। ধর্ম্ম-জীবন অর্থে পুরুষ প্রকৃতির পূর্ণ-যোগসাধন। সাধ্য যাহা তাহাই সাধক। কলুষ নাশ না হইলে এ সকল কথার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম হয় না—তাই নিষ্কলুষ হওয়ার সাধনাই সাধকের প্রথম করণীয়।

মন্ত্রের সাধনে আধার নিষ্কলুষ হয়। মন্ত্র—ভাগবত ঝঙ্কার। ঈশ্বর-তত্ত্বে শ্রদ্ধা জন্মিলে, সাধনায় অধিকার জন্মে—সৎ-সংসর্গ আপনি লাভ হয়। সূর্য্যোদয়ে আর অন্ধকার থাকে না; ভগবানের নামে—অসতের সঙ্গ আপনা হইতে অপসারিত হয়। তখন যে আশ্রয় মিলে, উহা যে বস্তুই হউক না, সাধন ভজনের ইন্ধন-স্বরূপ গুরু-বস্তু ভিন্ন অন্য কিছু নহে। বীজ বিনা

যেমন বৃক্ষের উৎপত্তি হয় না, জীবের সুপ্ত ঈশ্বর-ভক্তি উপদেষ্টা বিনা জাগে না।

আত্মসমর্পণের মূলসূত্র—এই গুরু-করণ। ভারতের এ সনাতন বিধি ত অসিদ্ধ নহে।

জীব অসংখ্য সংস্কার ও অভ্যাসের বশে মতিচ্ছন্ন, অন্ধ-চক্ষু, অমৃত ও বিষের পরিচয় জানে না; কিন্তু সেই পরম বস্তু অপ্রাপ্ত নহে। যাঁহার আজ্ঞায় প্রাপ্তি-চিত্তে সাধ্যবস্তুর সাধনায় রতি জন্মে, তাঁহাকেই প্রথম আশ্রয় করিতে হয়। আত্মদানের বিনিময়ে দীক্ষার সূত্রপাত। দীক্ষিতের ধর্ম্ম—আত্মাহুতি দেওয়া। সঙ্কোচহীন আত্মাহুতির ফলেই রসের সৃষ্টি; সে রস শুদ্ধ আধারে বিশুদ্ধ। সে রসের ভোক্তা—স্বয়ং ভগবান। জীবনক্ষেত্র তবেই শ্রীক্ষেত্র—পুরুষোত্তমের লীলানিকেতন।

সাধনা—দর্শন সাহিত্য নয়। শাস্ত্রানুশাসনে জীবন উন্নত হয়। শাস্ত্রের পথ—বাঁধা-ধরা পথ। সে পথে ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। কিন্তু যে সাধনার কথা বলিতেছি—ইহাতে হিসাব-বোধ রাখা চলে না। শুধু প্রস্তুত হওয়া নয়, অপ্রাপ্ত বস্তুর অনুধাবনের উদ্যোগ

করা নয়, ইহা প্রাপ্তবোধেই ঝাঁপাইয়া পড়া। চাই দুর্জ্জয় সাহস, অন্তহীন বিশ্বাস। সে বিশ্বাসের দিক্-চক্রবাল অনন্তে গিয়া ঠেকা খাইয়াছে, তাই শেষ দেখা যায় না—তাই তোমরা ইহাকে অন্ধ বিশ্বাস বলিতে পার। কিন্তু

"আমার স্বকার্য্য এই যদি কেহ মানে।
অসম্ভব সম্ভব হয় পৈশে তার কাণে॥"

আমার সত্যকে আমি জীবন মরণ পণে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছি; ইহার জন্য অনন্ত জীবন ঢালিয়া দিব। বস্তু কি ঈশ্বর-তত্ত্ব হইতে ভিন্ন? বাহির ধরিয়া সাধনা চলে না, গুণকেই ধারণ করিতে হয়। দীক্ষায় এ জ্ঞান পরিস্ফুট হয়। প্রাপ্তি-বস্তু চিত্তে জাঁকিয়া বসিলেই সাধ্য-নিরূপণে আর দ্বন্দ্ব থাকে না, মুখ্য ও গৌণ বিচার লইয়া ভজন-কার্য্যে বিঘ্ন হয় না। দুই বস্তু ঈশ্বর-গুণে লীন হয়। নাম নামীর ভেদ থাকিতে আত্মসমর্পণ কোন্ কালে সিদ্ধ হইয়াছে? পূর্ব্বেই বলিয়াছি—ভগবানে রুচি জন্মিলে, রতি জন্মিলে, ভজনের আশ্রয় অবধারিত মিলে। আশ্রয়-তত্ত্ব লইয়া বিচার ততক্ষণ, যতক্ষণ ভগবৎ-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা

পল্লবগ্রাহী বুদ্ধিতে দোল খায়। আত্মার পিপাসা ব্যর্থ হয় না। মীনের জল-তৃষ্ণা অস্বাভাবিক। জীবের ঈশ্বর-প্রাপ্তি খুবই সহজ। তবে বুদ্ধির দোষে ঘুরপাক খাওয়া। কবীর বলিয়াছেন—

"কহত কবীর, শুন ভাই সাধু
সহজ মিলে অবিনাশীরে।"

বড় সহজ ঈশ্বর-তত্ত্ব।

"পূরণ ব্রহ্ম সকল ঘট বরতে
খোঁজত ফেরত উদাসী রে।"

উদাসী কেবলই ঘুরিয়া মরে। মানুষের অহঙ্কার ও মাৎসর্য্য ভগবানকে পাওয়ার পথ উৎকট আকারে খাড়া করিয়াছে। এই সহজ পথও ঐশ্বর্য্য-ভাবের মিশ্রণে দীন হীন কাঙ্গালের দুঃসাধ্য বলিয়াই প্রতীত হয়। সংসারী স্থির করিয়াছে—এ পথ তাহার নয়। কিন্তু প্রতি জীবে ঈশ্বর বাস করেন; সাধনার দ্বারা সকল অবস্থায়, সকল জীবের পক্ষেই ভাগবত জীবন লাভ করা আয়াসসাধ্য হইলেও, সম্ভব। কেবল চাই—চাওয়া। ঠাকুর যেমন বলিতেন, "মানুষ কাঁদে ধনের জন্য, পুত্রের জন্য, মানের

জন্য, কিন্তু ভগবানের জন্য ক' ঘটি কাঁদে!" মানুষ, কাঁদ তুমি, যেমন অবস্থায় যে ভাবেই থাক, অন্তর্য্যামীর জন্য অন্ততঃ দিনান্তে একবার করিয়া একবিন্দু অশ্রুপাত করিও, দেখিবে সাধনা মূর্ত্ত হইয়া ফুটিতেছে—অন্তরের অন্ধকারপুরী স্নিগ্ধ দীপালোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে। যে বস্তু নিত্য, জীবের প্রাপ্ত সম্পদ্, তাহা পাওয়া কি বিচিত্র কথা!

কলুষ-ক্ষয়ের জন্য, অকপট আত্মদান কর। গুরু—ভগবান। গুরুর আজ্ঞা শ্রদ্ধা-সহকারে মানিতে পারিলেই সাধুজীবন লাভ হইবে, পাপপূর্ণ বর্ত্তমান জীবনের ছেদ আসিবে। বৈদিক আচরণে যেমন নিজের পিতামাতার পিণ্ড দান করিয়া আত্মশ্রাদ্ধ সমাপনান্তে নবজীবন লাভ করিতে হয়, বাংলার এই সহজ সাধনায়ও তদ্রূপ বিধি আছে। অধ্যাত্ম সাধনায় অনুষ্ঠানের আড়ম্বর না থাকিলেও, ঈশ্বর-পথের যাত্রীকে পূর্ব্ব গোত্র ফেলিয়া দিতে হয়, গুরু-জাতি-ধর্ম্ম যজিতে হয়। এই যজন যাজনে যে জাতি গড়ে, তাহাই স্বজাতি। স্বজাতি-সেবনে সর্ব্বপুষ্টি ঘটে। এই পূর্ণ গোষ্ঠীই তো দেবজাতির ভিত্তি। আত্মসমর্পণে যে বস্তুর আবির্ভাব, সিদ্ধযোগে

তাহার সঞ্চার হয়—এই সঞ্চার স্বরূপের সঞ্চার, স্বরূপে স্বরূপে মিলিত হইয়াই জাতির সৃষ্টি। বাঙ্গালীর অধ্যাত্ম ইতিহাসে এইরূপ প্রযত্নের বিস্তৃত কাহিনী আছে, আজ ইহার স্থায়ী রূপ দিবার দিন সমাগত।

যে রতি আশ্রয়-তত্ত্বে আরোপ করিতে হয়, সে রতি কি বস্তু, কোন্ জগতের ধন? এই তত্ত্ব ভিতর হইতে তখনই স্ফুরে, আবিস্কৃত হয়, যখন আশ্রয়-বস্তুতে ঐকান্তিক নিষ্ঠা দৃঢ় হয়। শ্রদ্ধার নৈরন্তর্য্যে সাধু সংহতি অটুট হয়, ভজন-প্রবৃত্তি উথলিয়া উঠে, উপাসনার আস্বাদ নিষ্ঠাকে দৃঢ় করে। আস্বাদের কারণ—রসোৎপত্তি। রতি—রসের মূল। এই রতি যাহা হইতে জন্মায়, সেই রসময় ভাগবত পুরুষের চরণে আপনাকে ডালি দিতে মানুষের কুণ্ঠা ক্ষুদ্রত্বের অহঙ্কার বৈ আর কিছু নয়। দীক্ষার পূর্ণাভিষেকে যদি রসের আস্বাদ না মিলে, উপাসনার ত্রুটি আছে জানিও। অকুণ্ঠ আত্মদানে আতঙ্ক থাকিতে উৎসর্গ-যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিতে বাধে—অথচ মন্ত্রাশ্রয়ী সাধক ভাব-সাধনায় পৌঁছিতে পারে না, যদি আত্মসমর্পণ যোগ সিদ্ধ না হয়।

আত্মসমর্পণ—জীবের সাধনা। প্রকৃতি সাধেন

পূর্ণযোগ। আত্মসমর্পণে জীবের মুক্তি হয়, জাগেন প্রকৃতি। কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণে, জীবের প্রচেষ্টা নিবৃত্ত হয়। সাধ্যবস্তু তখন সাধনা করে। ইহা বিজ্ঞানময় কোষের সাধনা। কিন্তু এ যোগ কৃপাসিদ্ধ বা সাধনসিদ্ধ নয়। ইহা নিত্য-সিদ্ধ। জীবের চেষ্টা করিয়া ঈশ্বরে রতি—পুরুষের নারী সাজিয়া, অভিনয় করার নামান্তর। সাধনার পথে অনেক মার এড়াইয়া, এই শুদ্ধ রাগের উদয় হয়। ভিতরের সহজ বস্তু কৃপালব্ধ হইবে কেন? যাহা সিদ্ধতত্ত্ব তাহা সাধনায় আয়ত্ত করার প্রচেষ্টা—অহঙ্কারকেই প্রশ্রয় দেওয়া। তাই সাধনার প্রথমেই গুরু-স্থানে বস্তু জানিতে হয় এবং প্রাপ্তি-চিত্তেই ইহার ভজন শ্রেয়ঃ। গুরুমুখে এই তত্ত্ব বিদিত না হইলে, বস্তুর জ্ঞানমূলে অহঙ্কার থাকা বিচিত্র নয়। অধিকারী-বোধের গরিমা আছে। সে গৌরবের লাঘব হয়—গুরু-মুখে তত্ত্বের অবগতিতে। প্রথমে জানা, তারপর আনুগত্যের সাধনায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিরহঙ্কার করা। অহঙ্কারের লেশ থাকিতে বালুতে গৃহ-রচনার মত সবই নিষ্ফল হয়। তত্ত্বজ্ঞ হইয়া লাভ নাই,

সর্ব্বতত্ত্বের ঠাকুর জীবনময় হইবে, তত্ত্বজ্ঞান লোপ পাইবে, রহিবে কেবল রস আর ভোগ—তবেই জীবনের সার্থকতা।

জীব—প্রকৃতির বশ। জীবের সাধনা—প্রকৃতিরই সাধনা। জীবের অহং-নাশের সঙ্গে, যাহা অপ্রত্যক্ষে ঘটে তাহাই প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। যতক্ষণ জীবভাব, ততক্ষণ শ্রীগুরুচরণ-প্রাপ্তির ভাব। তাড়াতাড়ি এই ভাব হইতে সরিয়া পড়িতে হইবে—এইরূপ দুরাকাঙ্ক্ষা আদর্শ-বাদীর কল্পনা। ইহা প্রকৃত সাধনা নহে। সাধক যাহা করে, প্রাণ ঢালিয়া করে। অবস্থান্তর আপনা হইতেই হয়, চেষ্টায় হয় না। জীবের সিদ্ধি—প্রকৃতিসিদ্ধ হওয়ায়। নারী তাই সাধনার ক্ষেত্রে পুরুষের অপেক্ষা এক ধাপ আগাইয়া আছে। পুরুষের মুক্তিতে নারীর মুক্তি—নারী পুরুষের সাধনায় উত্তর-সাধিকা। পুরুষের অপেক্ষা দিব্য জীবনের আগ্রহ নারীর অধিক। এই জন্য নারীর আশ্রয়—যে কোন ভাবেই হউক—সাধকের পক্ষে অনেক সময়ে দুরতিক্রমণীয়। অবশ্য যাহারা বৈরাগী, তাহাদের কথা বলি না; পূর্ণযোগীর সাধনে ইহার প্রয়োজনীয়তা আছে।

কিন্তু গুরু-গত জীবনেই ইহার অব্যাভিচারী ক্রম নির্দ্দিষ্ট হয়।

যন্ত্রবোধের সাধনায় সাধকের অহঙ্কার খসিয়া পড়িলে, স্বয়ং প্রকৃতি সাধনায় প্রবৃত্ত হন। জীবের যে রতি গুরুর আশ্রয়ে আভাসে দেখা দিয়াছিল, উহার অষ্টবিধ রূপ ফুটিয়া উঠে—মনে, প্রাণে, সর্ব্বেন্দ্রিয়ে। পূর্ব্বে সব কিছু টানিয়া টানিয়া করা হইত, এখন স্বচ্ছন্দ গতিতেই রসের উৎস উথলিয়া উঠে। সাধনায় কৃচ্ছ্রতা থাকে না। চক্ষুকে ফিরাইতে হয় না বিচার করিয়া সাধ্য বস্তুতে, কর্ণকে স্থির রাখিতে হয় না নিষ্ঠা-ভঙ্গের ভয়ে; বরং বিপদ ঘটে মনের—দশ ইন্দ্রিয় আরোহীরূপে, এক অশ্ব মনকে লইয়া টানাটানি করে, রূপের অভিসারে। মন্ত্রের ধ্যানে এতদিন যাহাদের আড়ষ্ট রাখা হইয়াছিল, স্মরণের যজ্ঞবেদী-তলে যাহাদের দীর্ঘ দিন হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া থাকিতে হইয়াছিল, শক্তির জাগরণে তাহারা মুক্তি পায়। দীক্ষার পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়বৃত্তি প্রমাথী হইলেও, তাহাদের মধ্যে ঐক্য ছিল না, সর্ব্ব-পুষ্টি হয় নাই—অপরিণত মত্ত ইন্দ্রিয়ের অনুধাবন মনের সামর্থ্যে বাধিত না।

কিন্তু প্রকৃতি যখন অনন্ত ভগবানের প্রেমাভিসারে উদ্বুদ্ধ হয়, তখন এ মনের মরণ হয় ; কিছুক্ষণ ধড়ফড় করিয়া, ইহা প্রকৃতির কোলে আত্মদান করে। শুধু মন নয়, সকল অন্তর-বৃত্তি নিরুপায় হইয়া মরিয়া জনম লয়। ভিতরে নব জীবনের উৎসব আরম্ভ হয়। দিব্য জীবনের ইহা সূচনা। আত্মসমর্পণের সাধনা যে মন, প্রাণ, বুদ্ধি লইয়া সিদ্ধ হয়, পূর্ণযোগে তাহাদের প্রয়োজন হয় না। এই মরণের সুখ যাহারা না পাইয়াছে, সাধনায় তাহারা আর আগায় না, পূর্ব্ব অবস্থাতেই থাকিয়া যায়। আজ পূর্ণযোগীর থাক্, মহাশক্তির বরপুত্র দিব্য জীবনের অভিযানে শোভা-যাত্রা করিয়াছে। বাঙ্গালী গতানুগতিক পথের পান্থশালায় পড়িয়া থাকিবে না— ক্লান্তিহীন, বিরামহীন যাত্রায় চিরপ্রস্তুত থাকিবে।

১০

ভাবাশ্রয়, রসাশ্রয় আর প্রেমাশ্রয়—এই তিনটি পর্য্যায়ের কথা বৈষ্ণব সাধনায়ও পাওয়া যায়। প্রাকৃত জীবনের টানে আমরা সাধনাকে বিকৃত করিয়াছি; পরন্তু বাংলার সহজিয়া বৈষ্ণব সাধনার লক্ষ্য ছিল দিব্যজীবন, কেন না বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে দেবদেহে দেহান্তরের কথা বার বার উল্লিখিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান যুগ-ধর্ম্মের সহিত প্রচলিত সাধন-পদ্ধতির কোথায় মিল তাহা যদি দেখা যায় এবং শোধনে সাধনে তাহার মধ্য হইতে উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথ আবিস্কৃত হয়, তাহা হইলে সাধারণ জীবনেও আমরা নূতন যোগের সাফল্য লাভের আশা করিতে পারি। যে যোগ বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবনে সার্থক হয়, কালে তাহাই জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়া জাতি-জীবনকে উন্নীত করে।

বাংলায় লোকচক্ষুর অগোচরে এখনও যে সাধন-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত আছে, তাহা অবিশুদ্ধ জীবনে গর্হিত আচার আচরণে ন্যক্কারজনক পরিণতি লাভ করিলেও, সাধনার মূল বস্তু কদাপি এরূপ কদর্য্য নহে। অতীতের আবর্জ্জনা-স্তূপ হইতে এই মূল তত্ত্বের অবিকৃত প্রকাশ করা বাংলার অধ্যাত্ম সাধকের কাজ। যোগ যদি জাতির জন্য হয়, জাতি তাহার স্বভাব-ধর্ম্মের অনুকূল করিয়া উহা যে ভাবে গ্রহণ করিতে পারে, এইরূপ সুযোগ করিয়া দেওয়াই চাই।

বাংলার সাধন-নীতির অসংখ্য ধারা থাকিলেও, মূলতঃ ঐগুলি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম, সহজিয়া আর তন্ত্র। বাংলায় এই তিনের কোঠায় নানা আকারে নারী পুরুষে সাধনা করিতেছে। এই সাধন-তত্ত্বের মধ্যে অধ্যাত্মযোগ, হঠযোগ, রাজ-যোগ, সকল যোগের খিচুড়ি পাকাইয়া গিয়াছে। সামঞ্জস্যের চেষ্টা আছে, কিন্তু সিদ্ধি নাই। তাহার কারণ—মনের উপরে উঠিয়া অভেদ দর্শনেই সমন্বয়ের সম্ভাবনা, আজ পর্য্যন্ত মন লইয়াই আমরা মন্থন করিয়াছি, মন্থন-রজ্জুতে নিজেদের জড়াইয়া গড়িয়াছি

মতবাদ সম্প্রদায়, সাধনাকে বিশাল আকারে জাতি-ধর্ম্মে পরিণত করিতে পারি নাই। আজ কিছুদিন হইতে এই চেষ্টার আরম্ভ হইয়াছে মাত্র।

বাঙ্গালী শূন্যবাদী নহে। বাংলার সাধন-তত্ত্বে নির্ব্বাণের কথা নাই, মোক্ষ পরামুক্তির কল্পনা নাই; বরং কবির কণ্ঠে মর্ম্মছেঁড়া সুর উঠিয়াছে "এমন মানব জনম আর হবে না!" তবে যে গর্ভ-যন্ত্রণা হইতে চির পরিত্রাণের কাঁহুনী নিত্য জীবন-যোগের ছন্দে স্থান পাইয়াছে উহা বৌদ্ধযুগের প্রভাব। সে প্রভাব ঐ মুখস্থ কথায় কথায় থাকিয়া গিয়াছে, বাঙ্গালীর হাড়ে হাড়ে শিকড় গাড়িতে পারে নাই। গোড়ার কথা মনে রাখা চাই—বাঙ্গালী চাহে জীবন, ভাগবত জীবন। মায়াবাদীর যুক্তি বাঙ্গালী কোন দিন আঁকড়াইয়া ধরে নাই। আরোপের প্রভাব চিরস্থায়ী নহে। বাংলায় যে সন্ন্যাসবাদের প্রচেষ্টা, উহা ঘূর্ণিবায়ুর মতই আকস্মিক। শ্রীবিবেকানন্দকে আশ্রয় করিয়া যে সন্ন্যাসযোগ বাংলায় ভিত্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছে, দেশের বর্ত্তমান অবস্থার পক্ষে এইরূপ প্রতিষ্ঠানের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। ইহা জাতীয় উত্থানের পথে খাঁটি

যুগ-ধর্ম্ম, তাই ইহার ব্যাপ্তি ও স্থিতি সম্ভব হইয়াছে ; কিন্তু বাংলার জাতি-আত্মা যেদিন মাথা নাড়া দিয়া মুক্তি-বার্ত্তা ঘোষণা করিবে, বাঙ্গালীর ধর্ম্ম সেদিন পূর্ব্বাপেক্ষা আরও উজ্জ্বল ও বৃহৎরূপে সহজ বেশেই দেখা দিবে। স্বভাবের বিপরীত ধর্ম্ম বাংলার মাটিতে চিরস্থায়ী হইবে না।

তন্ত্রে, সহজিয়ায়, বৈষ্ণব ধর্ম্মে সন্ন্যাসেরও স্থান আছে ; কিন্তু উহা মায়াবাদীর সন্ন্যাস নহে। বাংলার সন্ন্যাসী ছদ্মবেশী গৃহী, ইহাদের চক্ষে কাম-কাঞ্চন লোষ্ট্র-তৃণের মতই তুচ্ছ, কোন আসক্তির সৃষ্টি করে না। উদাহরণ—সাধু নাগ মহাশয়। ষোড়শী যুবতী স্ত্রীর সহিত এক বিছানায় রাত্রি যাপন করিয়াও, তাঁহার শোণিত-তরঙ্গে কামনার হিল্লোল বহিত না, ধমনী স্পন্দনে স্পন্দনে ভাগবত মন্ত্র জপ করিত। এমন কত আছেন, কে তাঁহাদের সন্ধান রাখে!

শ্রীচৈতন্যের বৈরাগ্য-ধর্ম্ম গ্রহণের পর বাংলায় সন্ন্যাস-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন। ইহা বাঙ্গালীর গড়া, কাজেই উপেক্ষার নহে। কিন্তু নবদ্বীপ-চন্দ্রের সন্ন্যাস গ্রহণের মূল কথা যদি তলাইয়া দেখা যায়, তাহা হইলে বুঝা

যায়, উহা পাষণ্ড দলনের অস্ত্র-রূপেই গ্রহণ করা হইয়াছিল। তারপরে গঙ্গাদর্শনে, যমুনা-ভ্রমে ভাব-বিভোর শ্রীগৌরাঙ্গ স্তব করিতেছেন ঃ—

"চিদানন্দভানোঃ সদানন্দসূনোঃ
পরপ্রেমপাত্রী দ্রবব্রহ্মগাত্রী।
অঘানাং সেবিত্রী জগৎক্ষেমধাত্রী,
পবিত্রীক্রিয়ান্নো বপুর্মিত্র-পুত্রী॥"

এই বলিয়া গঙ্গাগর্ভে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন, তখন দেখা গেল, "এক কৌপীন—নাই দ্বিতীয় পরিধান!" এমন পাগল হইতে পারিলে, বাঙ্গালীর কৌপীন গ্রহণ সার্থক হইতে পারে। ঈশ্বর-প্রেমে উন্মাদ শ্রীচৈতন্যের ভাব লাভ না হউক, বেশগ্রহণ হইল। তার পরিণাম—বৈষ্ণবের আখড়ায় নব সংসার রচনার অস্বাভাবিক চিত্র! বাঙ্গালীর ধর্ম্ম ইহাকেও আত্মস্থ করিতেছে। বাধা—পরধর্ম্মের শাসন, আচার। বাঙ্গালী কিন্তু জাতিরক্ষায় পরম অনাচারী, এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে।

যেখানে লীলা নাই, সেখানে আত্মসমর্পণের বালাই নাই। লীলার জন্যই উৎসর্গ-মন্ত্রে দীক্ষা লইতে হয়। এই মন্ত্রের রূপময় দেবতা ভাবের প্রকাশেই আবির্ভূত

হন। সে দেবতা না পুরুষ, না প্রকৃতি—সে যে কি তাহা ভাষায় ব্যক্ত হয় না, সত্যই সে অনির্ব্বচনীয় তত্ত্ব। তবুও তাঁরে দেখা যায়, তাঁকে আস্বাদ করা যায়, আলিঙ্গনে, চুম্বনে, মাধুর্য্যের মধু-হিল্লোলে কে জানে তাঁকে ভরাইতে গিয়াই বুঝি আপনাকে তলাইয়া দিতে হয়! প্রেম-সুধানিধির অগাধ জলে, গভীর গম্ভীর শেহালাদল ঠেলিয়া, কোন অতলে ডুব দিয়াই সে রত্ন পাইতে হয়। হিয়ায় সে হার হইয়া দোলে। জীবনের এমন ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য আর কিছুতেই নাই। বিশ্ব বুঝি তারই অন্বেষণে বিমানে ঘুরিয়া মরে! ভাগবত বলিয়াছেন—

"বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥"

ব্রহ্ম, পরমাত্মা লইয়া আমার কি কাজ! ভগবান—সেও বুঝি বড় তুরীয় ভাবের সামগ্রী! আমি আজ দেহের উত্তাপের মাঝেই তাঁর পরশ পাইতে চাই, ধমনীর স্পন্দনে যদি তাঁর সাড়া না মিলে, জীবনের তো প্রয়োজন নাই। জীবন-কেন্দ্রেই চাই তাঁর প্রতিষ্ঠা।

সে আমার মানুষ।

"চণ্ডীদাস বলে—শুন রে মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।"

সবার উপরে মানুষ বড়—তাহার উপরে কে? সে আমার জায়া, পিতা, মাতা, সহোদরা, সে আমার সখা সুহৃদ্, আমার এই ত্রিশকোটী ভারতবাসী। আমার নয়নের আলো যতদূর ছুটে, ততদূর শুধুই সে। তার সাথে অভিন্ন বোধেই আমার সিদ্ধি, আমার সার্থকতা। তাই যারা মায়ার বাঁধন কাটিয়া ঈশ্বরের উদ্দেশে বনে ছুটে, তাদের কার্য্য দেখিয়া হাসি পায়—আমি নিত্য মায়ার ফাঁদে ব্রহ্মপদের অধিকারী হওয়ার আশায় বসিয়া আছি। আমার ঈশ্বরকে, দেবতাকে আমা থেকে পৃথক্ ভাবিলে বুক ফাটিয়া যায়। তার চাওয়ার সুর ধরিয়াই আমার কণ্ঠে গান, তার হাসির জোছনাই আমার ঠোঁটে হাসি হইয়া ফোটে—সে চলে, সে চায়, তাই চলি, তাই চাই—আমার মাঝেই তার সাড়া, তাহা না হইলে আমি আর কি?

উল্লাসের গানই গাহিতেছি, আসল কথা তবে কি?

এই যে প্রেম, মানুষকে ধরিয়া এই যে নিজেকে বিলাইয়া দেওয়ার খেলা, এ কি সবাই পারে ? ধন, জন, জীবন, যৌবন দান করিয়া অনেকে ফকির হয়, আত্মার উৎসর্গে সে-রূপে এ-রূপের মিশাল কে কোথায় সার্থক করিয়াছে ? সত্যই এমন সাধক কোটীতে একজনও মিলে কি না সন্দেহ ! মানুষের মনে, প্রাণে, দেহে যে আসক্তি, কামনা, তার নিত্য স্বরূপের আশ্রয়ই আমার মানুষ। সেই আমার ইষ্ট, আমার সহজ। তাকে কেন্দ্র করিয়াই আমার সকল বিলাস যখন ডুব দেয়, সেই রসামৃতে নবজন্ম লাভ হয়। আমি তো অন্য কিছু নয়—কতকগুলা বাসনার সমষ্টি। সে কামনা-ক্ষয়ে ফুটিয়া উঠে—আমার সত্য স্বরূপ। কামনা আসক্তির রূপ শিকড়-শুদ্ধ উপ্‌ড়াইয়া ফেলার সাধনাই—আসক্তির স্বরূপে ডুবিয়া মরা। তবেই শুদ্ধা রতি প্রকাশ পায় ; আর বলিয়াছি, এই রতিই রসের উৎস—এ আকর্ষণ যার জীবনে জাগে নাই, সে আত্মসমর্পণে উদ্‌বুদ্ধ হইবে কেন ?

অন্তরের টান ধরিলে, আত্মসমর্পণের বিষয় লইয়া বিচার যুক্তি থাকে না। তৃষ্ণায় যার ছাতি ফাটে, সে

কি জলের বিচার করে ? বিচার থাকিতে আত্মা জাগে না। আত্মা না জাগিলে, অভ্রান্ত আশ্রয় মিলে না। এই আশ্রয় নিরূপণের কথাই বৈষ্ণব সাধনায় আছে—

"সকল চন্দ বরণ মানুষ
এ কথা বুঝিবে কেঅ।
যে জনা পাঞাছে এই সে মানুষ
মরিয়া রঞেছে সেঅ॥"

কি তন্ত্র, কি সহজিয়া, উভয়ের কথাই—এই আত্মসমর্পণ। কোথাও ঠাকুর—স্বয়ং শ্রীভগবান-চন্দ্র, কোথাও সচ্চিদানন্দময়ী কালীশক্তি। তন্ত্রের পূর্ণতা—সহজিয়ায়। সে নিগূঢ় রহস্যের কথা বাঙ্গালীর কাছে আদৌ দুর্ব্বোধ্য নয়। জীবনের পিছনে আছে যে শক্তি বা সত্তা, তাহা ভৌতিক বা আন্তঃকরণিক কোন কেন্দ্রাশ্রিত সামগ্রী নয়। এইজন্য দেহগত, অন্তর ও বহির্যন্ত্রের অবস্থা-ভেদে ইহা রূপান্তরিত হয় না; বরং এই স্বরূপের অনুসরণে দেহ, প্রাণ, মন, সবের রূপান্তর সিদ্ধ হয়। দিব্য জীবন গড়ার এই পথ—বেদ-বিধি ছাড়া এই সিদ্ধ পথেরই সন্ধান বৈষ্ণব সহজিয়ারা দিয়াছেন।

ভাবের পর, রসাশ্রয়ের কথা। সেরস—কল্পনার সামগ্রী নহে। উহা চতুঃষষ্টি কলার সহিত সাধনা। তন্ত্র ও সহজিয়া একই, কেবল পরস্পর পরস্পরের প্রকরণবিশেষ—কেন না তন্ত্রেও চৌষট্টি কলার সহিত ভজনবিধি কথিত আছে। চণ্ডীদাসের কথায় বলি—

"বস্তুতে গ্রহেতে করিয়া একত্র
ভজহ তাহারে নিতি।"

এই মন্ত্রে গার্হস্থ্যজীবন গ্রহণের মধ্যে ভজনের নির্দ্দেশ পাই। আত্মতৃপ্তির জন্য সংসার নহে। বৈষ্ণব শাস্ত্রের অনুশাসন—সাধক আত্মতৃপ্তির হেতু ভোগের আহুতি গ্রহণ করিবে না। উহা কাম। সবই কৃষ্ণপ্রীতির অনুসরণ করিবে। লৌহ এবং হেমের সহিত কামের ও প্রেমের তুলনা করা হইয়াছে। সহজিয়া সাধক বলিতেছেন—

"দক্ষিণ দেশেতে না যাবে কদাচিতে
যাইলে প্রমাদ হবে,
এই কথা মনে ভাব রাত্র দিনে
আনন্দে থাকিবে তবে॥"
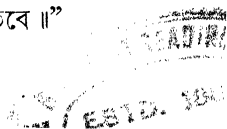
গৃহ-ধর্ম্মে যে স্ব-সুখের বশবর্ত্তী হয়, সে অশান্তি ভোগ করে। পদে পদে তার প্রমাদ উপস্থিত হয়। কৃষ্ণপ্রীতির জন্য যে দেহ-ধর্ম্ম হয়, উহা আনন্দের লক্ষণ। এ পরীক্ষা জীবনের নিত্য ঘটনায় লক্ষ্য করা যায়।

এইবার বুঝিতে হইবে—জীবনপ্রবাহের সহিত ভাগবত ইচ্ছার প্রবাহ যুক্ত না হইলে, এরূপ জীবন সম্ভব কি না! সম্ভব না হইলে, সাধন আশ্রয় করা চাই।

ভাবাশ্রয়ী প্রবর্ত্তক, রসাশ্রয়ী সাধক, প্রেমাশ্রয়ী সিদ্ধ। প্রথম, ভাবের মন্থন। রতি, রস, রূপের ইহাতেই উৎপত্তি। সাধক এই অনিবার্য্য সাধনাঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারে না, সতত ঈশ্বর-ধ্যানে দুর্নিবার রস-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়াই দিব্যজীবন লাভ করে। বৈধী হইয়া ভাবের সাধন, নিষ্ঠা ও ভক্তি রসাশ্রয়ীর সম্পদ্, সিদ্ধের তো কথাই নাই—রসকূপে ডুব দিয়াই সাধক সিদ্ধ হয়, প্রকৃতিকে অতিক্রম করে। সহজিয়ারা বলেন—

"প্রকৃতি পুরুষ হয় দেহান্তর হইলে,
রসাশ্রয় প্রেমাশ্রয় সাধন করিলে।"

সাধনার ইহাই নিগূঢ় কথা। এই সাধনপথে যেখানে মন্ত্র-গ্রহণ অনিবার্য্য হয়, সেখানে এই মন্ত্রগুরুকে আশ্রয় করিয়া, প্রবর্ত্তদেহ সাধক ভাবসাধনা করিতে থাকে। আশ্রয় পুরুষ বা নারী উভয়েই হইতে পারে। তবে চাই—স্বভাবকে প্রকৃতি করিয়া তোলা। কামনা থাকিতে ইহা সম্ভব নয়। ঠিক ঠিক সাধনা হইলে, পতনের সম্ভাবনা থাকে না ; ভাবের ঘরে চুরি হইলে, সব সাধনাই ব্যর্থ হয়। জীবন লইয়া সাধনা —আগুন লইয়া খেলা। দীক্ষা ও সাধনার যুগ—ত্যাগ ও সংযমের যুগ। এ ত্যাগ সংযম যার নাই, তার এ পথে আসা বিফল হইবে। সাধনপদ্ধতি নির্ভুল নয়, এ অভিযোগ যুক্তিসঙ্গত নহে। কথার চাপে, অনেকেই ভাবিবেন—এত হাঙ্গামায় যাওয়া কেন ? ধ্যান ধারণা, আসন প্রাণায়াম নির্ব্বিরোধী পথ, কিন্তু রসহীন ; পরন্তু যাকে পাইতে চাই, তিনি যে রসিক-শেখর। বাঙ্গালী চাহে কি—নিজেকে নিঃশেষ করা, না জীবনে সচ্চিদানন্দের প্রবাহ বহিয়া আনা ? নিশ্চয় ভাগবত জীবন। তাহা হইলে, তাহাকে জীবন-শিল্পের সাধনায় উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে।

কথার ফাঁদ দেখিয়া, সাধনা যে কিছু জটিল তাহা নহে। আসল কথা—কিছুকে আশ্রয় করিয়া দাঁড়ান। জপ, তপ, আসন, প্রাণায়াম, এ সকল চেষ্টা ঈশ্বরের ইচ্ছা-প্রবাহে ভাসিয়া আসিলে কোন বাধা নাই। সেখানে তো সাধনা নীরস বোধ হইবে না!

বলিয়াছি, এই আশ্রয় সর্ব্বতোভাবে হওয়া চাই। সাধক বলেন—"মন্ত্রাশ্রয় যেই কালে, গোত্রান্তর হয়।" অর্থাৎ বাপের নাম ভুলিয়া যাওয়া চাই। দীক্ষা যে একটা জন্মান্তর। পুরাতনের মরণ না হইলে, নব জন্মের সম্ভাবনা কোথায়? আতঙ্ক এইখানেই। সাধনায় নূতন জাতি গড়ে, পুরাতনের শেষ হয়। ভারতে এই সাধনার বিধি প্রবল বলিয়াই, এ জাতি নিত্য নূতন হইয়া আজও টিকিয়া আছে। সাধনার সত্য মর্ম্ম না বুঝিয়া, এ পথে অগ্রসর হইলে আঘাতে মুখ ফিরাইতে হইবে। তবে আছে একটা ছেলে-ভুলান লৌকিক ও ব্যবহারিক ধর্ম্ম—উহা কেবল মনকে চোখ ঠারা, মনের সান্ত্বনা। হরিনামের মালা ঘুরাইয়া কে কোথায় ঈশ্বর-লাভ করিয়াছে? আজন্ম আচারপরায়ণ

নিষ্ঠাবান্ হিন্দু মহাপ্রেমে উন্মাদ হইয়া, জগৎ পবিত্র করিয়াছে, শুনিয়াছ কি ?

সাধনা তোমায় পাগল করিবে, কাঙাল করিবে, অভিমান রাখিবে না, নিরহঙ্কার করিবে, লজ্জা, ঘৃণা ত্যাগ করাইবে। যেখানে দাঁড়াইলে মাথা নীচু হয়, কাঙাল সেইখানেই যাচ্ঞা করে, পায় উপেক্ষা আর অপমান, ঘরে আসিয়া বাছিয়া তাহার মধ্য হইতেই তিলে তিলে সঞ্চয় করে প্রেম—আরে মানুষ, তা না হইলে কি প্রেমাশ্রয়ী হওয়ার অধিকার পাওয়া যায় !

সাধনার বলেই, দেবজাতির সৃষ্টি। সর্ব্বতোভাবে মন্ত্র-গুরুর আশ্রয় যখন সাধককে গোত্রান্তরিত করে, তারপরই একে একে রসসৃষ্টি হইতে থাকে। করিতে হয় না কিছু, সবই হয়। এই অনির্ব্বচনীয় আত্মসমর্পণ যোগ বাংলার যে সিদ্ধ সম্পদ্। দীক্ষার সন্ধিযুগে, বড় সাবধান হইতে হয়। কোন সাধ বা বাসনা থাকিতে মন্ত্র-বীর্য্য নিষ্ফল হয়। নিষ্কাম চিত্তে আপনার উপর মন্ত্র-বীর্য্যের আরোপ সুসিদ্ধ হইলে, তারপর নদীর জোয়ারের মত, ব্যথা পুলক, রূপ অরূপ, সবই ভাসিয়া

আসিবে। কত অবস্থান্তর হইবে! এই দেহটার প্রকৃতিই হইবে সাধনা, তবে তো সর্ব্ব ভাবে, সর্ব্ব ঘটনায় রতি জন্মিবে। ইহা ভাল, উহা ভাল নহে, ইহা চাই, উহা চাই না—প্রকৃতির সহিত বিরোধেই এরূপ ভেদের উৎপত্তি। প্রকৃতির মধ্যে আপনাকে তলাইয়া দিয়াই স্বরূপ লাভ করিতে হয়। দীক্ষার সাফল্য—যেখানে প্রকৃতি সাধন-রূপে পরিণত হয়, আর চৌষট্টি কলার সহিত এই প্রকৃতিই ঈশ্বর-সাধন করে। অপ্রাকৃত বস্তু প্রকৃতির উপর না উঠিলে, লাভ হইবে কেন? বাংলার সাধনায় সে পথের এইরূপই নির্দ্দেশ আছে। জীবনকে কেন্দ্র করিয়া, ঈশ্বর-সিদ্ধ হইয়া উঠাই প্রকৃতি-সাধনার উদ্দেশ্য। তারপর, বিশুদ্ধ প্রকৃতি-যোগে নিত্য প্রকাশের খেলা। অতঃপর আর দুই চারিটী কথায় এই অবতরণের বিধান সম্বন্ধে আভাস দিয়াই নিরস্ত হইব।

১১

ধর্ম্ম—জাতির পরম সম্পদ্। ধর্ম্মহীন হইয়াই আমরা অধঃপতিত। আজ দেশে ধর্ম্মলাভের আকাঙ্খা জাগিয়াছে; কিন্তু ভস্মে ঘৃতাহুতির মত সাধকের আত্মদান প্রায় সর্ব্বত্র ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। তাহার কারণ, শিক্ষিত বাঙ্গালী গুরুমুখী হইয়া সাধন করে না। আর গুরুও দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে; যদিও মিলে সেদিকে নজর যায় না। আমরা চাই নামজাদা গুরু, গুরুর নামে বিকাইতে—সাধন তো চাহি না, চাহি নাম-প্রসিদ্ধি।

কিন্তু এমন করিয়া চিরদিন চলে না। অন্তরের ক্ষুধা না মিটিলে, বাহিরের বেশ-ভূষা অস্বস্তির হেতু হয়। ভগবৎ-পিপাসা প্রবল হইলে, অনুসন্ধানের প্রয়াস তীব্র হয়; শুষ্ক কণ্ঠে কেহ যদি তখন এক গণ্ডুষ জল ঢালিয়া দেয়, জীবন বিকাইয়া দিতে ইচ্ছা করে। আজ বাংলা

মরুভূমি, ধর্ম্ম-পিপাসা চরিতার্থ হওয়া দুরূহ হইয়াছে, পল্লীতে পল্লীতে সিদ্ধ সাধকের আস্তানা উঠিয়াছে, সাধুর ছদ্মবেশে ভণ্ডের প্রসার বাড়িয়াছে। আন্দোলন আছে, নাই সাফল্য, সার্থকতা।

বাংলার সাধনা কোনদিন সভা করিয়া, প্রচারকের কণ্ঠে প্রকাশ পায় নাই ; মঠে মন্দিরে, সাধনার মর্ম্ম-কথা কেহ শুনায় নাই। বাংলার সাধন গোপন নিগূঢ় রহস্য, গুরু ও শিষ্যের মধ্যেই ইহার আদান প্রদান চলিত। যে ভাষায় কথাবার্ত্তা হইত, তাহাও সাধারণের বোধগম্য ছিল না, সাধনায় সাঙ্কেতিক বচন ব্যবহৃত হইত। একজনের সাধন-পথ অন্যজনের প্রযুজ্য নহে, অথচ এক ক্ষেত্রে দশজনে স্বতন্ত্র ধারা ধরিয়া সাধনা করিত। অধিকারি-ভেদে গুরুর নির্দ্দেশ ছিল—বেদবাক্য ; কাজেই কেহই কারও সাধন-পথের ব্যর্থ অনুকরণ করিত না। প্রকৃতি-ভেদে গুরু-নির্দ্দেশ অনুসারে জীবনকে চালিত করিয়া, সাধক অপ্রাকৃত বস্তুলাভের উপযোগী হইত।

বেদ, উপনিষৎ, পুরাণ, দর্শন-শাস্ত্র প্রভৃতি জ্ঞান-চর্চ্চার উপকরণ সাধনার অঙ্গ হইলেও, এইগুলি পূর্ণাঙ্গ নহে। সাধনা—জীবনব্যাপী বিশিষ্ট অভ্যাস-বিশেষ ;

উহা একটা ক্রিয়া—সাহিত্য বা কাব্য নহে। সাধনার নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করার প্রচেষ্টা বৈষ্ণব-যুগ হইতেই দেখা যায়; নতুবা সাধন-তত্ত্ব চিরদিনই গোপন রহস্য-জাল-জড়িত, বিনা সাধনায় ইহার মর্ম্ম উপলব্ধ হইবার নহে। তাই ভাষায় ফেনাইয়া, ইহার আলোচনা বড় করা হইত না। যথারীতি দীক্ষালাভের পর, সাধক গুরূপদেশে পরিচালিত হইত।

বাঙ্গালীর সাধনা—দেহতত্ত্ব ও আনন্দবাদের সহিত বিজড়িত। দেহও সাধ্য বস্তু। সহজিয়ারা বলেন :—

"সকলের সার হয় আপন শরীর।
নিজ দেহ জানিতে আপনি হবে স্থির॥"

এই দেহ-বিজ্ঞানের সাধনা অধিকারি-ভেদে বিভিন্ন প্রকারে সাধিত হইত। আজ মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে, দেহ-শুদ্ধির একমাত্র উপায় হঠযোগ—তরুণ-মহলে ইহাই স্থির হইয়াছে। বাংলার সাধন-তত্ত্বে প্রাণায়াম ইত্যাদি কষ্টসাধ্য সাধন-পদ্ধতির যে একেবারেই স্থান নাই, তাহা নহে। তবে পুঁথিগত বিদ্যার সহিত ইহার আদৌ মিল নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গুরুমুখী হইয়া সাধন না করিলে সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। দেহ-শুদ্ধির উদ্দেশ্য—

"দেহকে জানিতে যদি পার ভাল মনে
দেহেতে সকল আছে এ চৌদ্দ ভুবনে ॥"

অণিমা লঘিমাদি ঐশ্বর্য্য লাভের প্রত্যাশায়, বাঙ্গালী দেহের সাধন করিত না। আশ্রয়-তত্ত্বকে জানিবার জন্যই দেহ-তত্ত্বের সাধনা। জীব দেহের স্থাবর অধিকারী। দেহকে জানিয়া, আশ্রয়-তত্ত্বকে জানিতে হইত। এই দেহ-শুদ্ধির বহু পর্য্যায় ও বিচিত্র বিধান আছে।

"নিজ দেহ জানিতে আপনি হবে স্থির"—এই এক ছত্রেই, সাধককে শান্ত সমাহিত হইতে উপদেশ দেওয়া হইতেছে। বাসনা ও চেষ্টা প্রাণকে সন্তাড়িত করে; সুতরাং ইহার একান্ত নিরসনে শরীর স্থির হয়। শরীর স্থির হওয়া এক প্রকার সমাধির অবস্থা এবং তখনই আশ্রয়-তত্ত্বের উপলব্ধি হয়। ব্যাপার বড় ছোট নহে।

শরীর স্থির করিতে হইলে, কোন বস্তুতে ইহার সকল প্রবৃত্তি তুলিয়া ধরা চাই। সে বস্তু—শূন্য নয়। উহাই স্বরূপ। এই স্বরূপের উপরেই জীবনের সবখানি উঠাইয়া ধরার সাধনায়, বহির্ম্মুখী প্রবৃত্তি রুদ্ধ হয়, শরীর আপনা হইতেই স্থির হইয়া আসে।

দেহেরই স্বভাব-ধর্ম্ম—আসক্তি। উহার নামান্তর মোহ, মমতা। বাঙ্গালী স্বভাবের বলেই ঈশ্বর-তত্ত্বের অনুরাগী হয়। এই অনুরাগ—আত্মপ্রতিষ্ঠিত সত্যের অধিকারী হওয়ার একমাত্র উপায়।

এইখানে ত্যাগ ও নিষ্ঠার কথা আসিয়া পড়ে। ঈশ্বর-বস্তুপ্রাপ্তির প্রয়াস যার, তাহাকে সর্ব্বস্ব ছাড়িতে হয়। সব কিছু বজায় রাখিয়া, এ পথে কেহ কখন যাত্রা করে না। ব্যবহারিক ধর্ম্ম ইহা হইতে আমূল স্বতন্ত্র। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই সাধনায় অবধারিত সাধক গোত্রান্তরিত হইবে, স্বরূপ লাভ করিয়া নব সংসার নির্ম্মাণ করিবে; তবেই নব বৃন্দাবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হইবে। দেবরাজ্য, স্বর্গরাজ্য, এই সব একই ভাবের বিচিত্র প্রকাশ-ভঙ্গী বৈ ত আর কিছু নয়!

বিসর্জ্জনের ভয়ে যে আত্ম-রক্ষায় উদ্যত, সাধন তার জমে না। জীবনের ভিত্তিও তাই তার বালুর উপর, মরণের বাতাসে টলমল করে। আত্ম-দানে নিঃসংশয় সাধক জীবনেই মরণের মন্থন-ব্যথা সাধনার অনিবার্য্য অবস্থা বলিয়া গ্রহণ করে। তাই সে জীয়ন্তেই মরে। গুরুর অন্তরে সে পরাণ বাঁটিয়া লেপিয়া দেয়। এ মরণের আস্বাদ

মর্ম্মী ভিন্ন কারে আর বুঝাইব? সাধনাবস্থায়, গুরু ও শিষ্যের মধ্যে এই মধুর মমত্ব—জীবন-মরণের রঙ্গে উভয়ের মত্ততা যদি চূড়ান্ত হইয়া না উঠে, স্বরূপের সন্ধান তবে দুরাশা জানিবে। কোথায় সে গুরু, কোথায় সে আত্মহারা শিষ্য—নারীপুরুষ-ভেদে সাধনার এ রঙ্গ যেখানে ঘটে, সে স্থান স্বর্গ, সাধনার পরম তীর্থ!

এইরূপ একটা মরণের মধ্যেই অনুরাগের জন্ম। দীক্ষা যার সত্য, তার গুরূপদেশে দেহান্তরেও বাধে না। জীবনের আশা রাখিয়া তো সাধন চলে না। সাধক সে তো মরিয়া সে তো চাহে না আত্মপ্রতিষ্ঠা, আত্ম-সম্মান। সে চাহে ঈশ্বর-গতি। মানুষ-ভজন তারই নিকট নিরর্থক, যে স্বরূপ-বোধে এই আনুগত্য স্বীকারে কুণ্ঠিত। গুরু-করণের অধিকার সবাইয়ের থাকে না।

গুরুকে স্বরূপ বোধে যে অনুরাগের উৎপত্তি, উহা সাধ্য বস্তু। এই রাগ-সিদ্ধি না জন্মিলে, নিগূঢ়ে পৌঁছান যায় না। রাগের অধিকারী হওয়া বড় কম তপস্যার কথা নহে। এই রাগ সাধনার কষ্টিপাথরে ঘষিয়া ঘষিয়া যত খাঁটি হয়, ততই স্বরূপের প্রতিবিম্ব গুরু-বস্তু চিন্ময় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। আশ্রয় আত্মস্থ হয়—হৃদয়ের

মণিকোটায় কোটী ইন্দুপ্রভা-সমন্বিত সহজ পুরুষের সাক্ষাৎকার মিলে। চণ্ডীদাস সত্যই বলিয়াছেন—

"মানুষ ভজন কেমনে হয়।
সাক্ষাৎ নহিলে কিছুই নয়।"

মরণ-মন্থন গুরু ও শিষ্য উভয়কেই সহিতে হয়। এ তত্ত্ব বাংলায় যেমন প্রকট, এমন আর কোথাও নয়। তাই মনে হয়, ভাগীরথীপদ্মাধ্যুষিত পবিত্র বঙ্গভূমি—এই নব-জাতির আদিপ্রসূতি।

সাধ্য ও সাধন—ভিন্ন প্রকরণ-সিদ্ধ। সাধ্য বস্তু—স্বরূপ; রাগ—ইহার প্রকরণ। স্বরূপ বিহনে রূপের অস্তিত্ব নাই। কিন্তু এই রূপের সাধন আছে। স্বরূপ পাইলেই সবখানি হইল না, রূপের জন্ম হওয়া চাই। ইহাই নবজন্ম। স্বরূপকে আশ্রয় করিয়া যে স্থিতি ও ভোগ, তাহাই তো সাধকের লক্ষ্য! এই লক্ষ্য-সাধনে বাঙ্গালীর চেষ্টা হাজার বৎসর ধরিয়া চলিয়াছে। কিন্তু সাফল্যের অন্তরায়—মানুষের অতি সতর্কতা ও সাধনাকে তত্ত্ব-হিসাবেই শিকায় তুলিয়া রাখা। উহাকে নামাইয়া জীবনে ফলাইয়া তোলা কোথাও ভয়ে ঘটিয়া উঠে নাই, কোথাও বিকৃত দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। তরুণ সাধককে বিশুদ্ধ

স্বরূপের উপর ভর করিয়াই, দিব্য সৃষ্টি থরে থরে নামাইয়া আনিতে হইবে। বাংলায় নবজাতি প্রতিষ্ঠার ইহাই মর্ম্ম-কথা।

যে সত্য রাগ-ধর্ম্মী, সে নিত্য-দেহের সন্ধান পাইয়াছে। নিত্য তত্ত্বের বোধ তার অটুট হইয়াছে। ইহার পর চাই—রূপের সাধনা। মন্ত্র-গুরুর আশ্রয় এই কালে ধীরে ধীরে অপসারিত হয়; সত্যাশ্রয়ী সাধক আত্ম-ধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া, তখন রসাশ্রয় করে। বিশুদ্ধ ধর্ম্মের লক্ষণ—অখণ্ড ও অকাম হওয়া। ভেদ-জ্ঞান থাকিতে রূপের সাধন হয় না। কামনা রাখিলে, প্রেমের আস্বাদ মিলে না। অপরিপক্ক অবস্থায় রসাশ্রয়ে প্রবৃত্ত হইলে, সাধকের পতন হয়। উত্তম সৃষ্টি সেখানে গড়িয়া উঠে না।

স্বরূপেরই—রূপ। সংসারে যে রূপের আগুনে অসংখ্য নরনারী দিবানিশি পুড়িয়া মরে, সে রূপের সহিত এ রূপের তুলনা হয় না। তবে সহজ সামান্য রূপ ছানিয়াই স্বরূপের সন্ধান মিলে; আবার স্বরূপ হইতে রূপের পুনরুৎপত্তি ঘটে। কথাটা আরও একটু খুলিয়া বলি।

বাংলার সাধন-তত্ত্ব—জাতি-গঠনের সিদ্ধ তন্ত্র। এই যে স্বরূপের সাধনা, ইহা আপনার মধ্যেই অখণ্ড অকাম পুরুষ-প্রকৃতির সংযুক্ত রূপ। প্রবর্ত্ত সাধনায়, বিচ্ছিন্ন আসক্তিকে গুটাইয়া স্বরূপের সন্ধানে ঊর্দ্ধমুখী করিয়া কেন্দ্রীকৃত করিতে হয়; আবার সাধনার সাহায্যেই স্বরূপকে বিযুক্ত করিয়া নীচে নামাইয়া আনিতে হয়। একই স্বরূপ দ্বিধা-বিভক্ত—রূপের মন্থনে নববৃন্দাবন রচনা করে। বাংলায় যে ভবিষ্য দিব্য সমাজগঠনের স্বপ্ন, তাহা এই তপস্যার সাহায্যেই সম্ভব হইবে।

স্বরূপ পাইলে, সবাই যে রূপের হাট পাতে, তাহা নহে। এখানে কামনার আঁচ নাই। সবই ঘটে—ভগবানের ইচ্ছায়। ঊর্দ্ধমূল অধঃশাখ বৃক্ষের মত, ভগবানই আত্মপ্রকাশ করেন—রাগ ও রতি রূপে। প্রকৃতি ও পুরুষ—সেই একেরই অভেদ-মূর্ত্তি।

অখণ্ড, অকাম, আনন্দময় সত্তা বিগলিত হয়—রস-রূপে। এই রসেই—রূপের সৃষ্টি। রূপ না হইলে,প্রেমের আস্বাদ মিলে না। প্রেমাশ্রয়ই সাধনার শেষ কথা। এই জন্যই পূর্ব্বে সাধনার তিনটি পর্য্যায়ের কথা বারম্বার

উল্লিখিত হইয়াছে। প্রবর্ত্ত দশায়, সাধককে উপরে উঠিতে হয়—ভাগবত স্বরূপে আপনাকে ডুবাইয়া দিতে হয়। তারপর রস-প্রবাহে ভাসিয়া, রূপের জগতে অবতরণ করিতে হয়। প্রেম ও আনন্দের নিত্য লীলাই জীবনের পরিণতি। মর্ত্ত্যে ইহার সিদ্ধ মূর্ত্তি—দেবজাতি। স্বরূপের ষড়ৈশ্বর্য্য ছানিয়া, নব সঙ্ঘ, সমাজ, রাষ্ট্র রূপে সেই মহাজাতিরই আবির্ভাবের ধারা-নির্দ্দেশ হইয়াছে। আত্মসমর্পণের মহাতীর্থে, সেই কল্প-সিদ্ধ জাতি-রূপের অবতরণ সার্থক হইবেই।